ইউনিট- ২

শিশুর বর্ধন ও বিকাশ

ইউনিট ২ শিশুর বর্ধন ও বিকাশ

ভূমিকা

গর্ভধারণের মুহূর্ত হতে মৃত্যু পর্যন্ত মানব সন্তানের পরিবর্ধন, পরিবর্তন ও আচরণ নিয়ে যে বিষয়ের চর্চা করা হয় তাকেই বিকাশ মনোবিজ্ঞান বলে। মানব জীবন চক্রে শিশুকালেই সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন সংঘটিত হয়। শিশুকে যথাযথভাবে শিক্ষা দিতে হলে তার সার্বিক বর্ধন ও বিকাশ প্রক্রিয়া সম্পর্কে শিক্ষকের সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। জীবনের প্রাথমিক বছরগুলিতে দৃষ্টিভঙ্গী, অভ্যাস এবং আচরণ নমুনা প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যক্তি বড় হয়ে কতটা সাফল্যের সংগে সামঞ্জস্য বিধান করবে তা তার বিকাশ প্রক্রিয়া দ্বারা অনেকাংশে নির্ধারিত হয়। গঠনমূলক এই সময় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান দেওয়া শিক্ষকের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়।

বিভিন্ন প্রকারের বিকাশ বলতে এখানে শারীরিক, ব্যক্তিগত, জ্ঞানীয়, সামাজিক ও ভাষায় বিকাশকে বুঝানো হয়েছে। বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন দিকের এই বিকাশগুলো আমরা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করবো। আলোচনার সুবিধার্থে এই ইউনিটকে মোট আটটি পাঠে ভাগ করা হয়েছে। এই পাঠগুলো হচ্ছে:

পাঠ- ২.১: বর্ধন, বিকাশ ও পরিণমন
পাঠ- ২.২: শারীরিক বিকাশ
পাঠ- ২.৩: জন্ম পরবর্তীকাল থেকে শৈশব
পাঠ- ২.৪: পেশী সঞ্চালনমূলক বিকাশ
পাঠ- ২.৫: বাল্যকালের শারীরিক বিকাশ
পাঠ- ২.৬: জ্ঞানীয় বিকাশ: শৈশব থেকে কৈশোর
পাঠ- ২.৭: ভাষার বিকাশ
পাঠ- ২.৮: সামাজিক বিকাশ

পাঠ ২.১ বর্ধন, বিকাশ ও পরিণমন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বর্ধন, বিকাশ ও পরিণমনের অর্থ বলতে পারবেন;
- বিকাশের সংজ্ঞা দিতে পারবেন;
- সুস্থ স্বাভাবিক বিকাশমান শিশু কারা, সে সম্পর্কে বলতে পারবেন এবং
- স্বাভাবিক বিকাশ ধারার বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

বর্ধন, বিকাশ ও পরিণমন

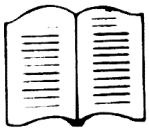

বর্ধন এবং বিকাশ দুটি প্রক্রিয়া অত্যন্ত ব্যাপক। এগুলি এমন সামগ্রিক পরিবর্তনকে বুঝায় যা ব্যক্তির দৈহিক পরিবর্তন, প্রতিভা, বিভিন্ন অর্জিত গুণাগুণ ও দক্ষতার মাঝে নিহিত রয়েছে। মানুষের বিকাশমূলক গতি অবিচ্ছিন্ন। মাতৃগর্ভে জন্মলাভের মুর্হূত থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কখনও দ্রুত এবং কখনও ধীরে এই পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ফলে এক পর্যায়ে যে পরিবর্তন ঘটে তা পরবর্তী পর্যায়গুলিকে প্রভাবিত করে।

শিশুর স্বাভাবিক বর্ধন ও বিকাশ সম্পর্কে ধারণা অর্জনের জন্য এ দুটি শব্দ এবং সেই সাথে তৃতীয় আর একটি শব্দ পরিণমনের অর্থ বুঝতে হবে। এই তিনটি শব্দ অনেক সময় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

বর্ধন (Growth): বর্ধন বলতে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ কোষ সংখ্যা বৃদ্ধিকে বুঝায়। যেমন- দেহের ওজন বৃদ্ধি, উচ্চতা বা দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি। অর্থাৎ বর্ধন হল ব্যক্তির মধ্যে সংঘটিত পরিমানগত পরিবর্তন।

বিকাশ (Development): এর অর্থ পরিবর্তন। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি ও সে সবের কর্মক্ষমতার সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবর্তনকে বিকাশ বলে। বস্তুত বিকাশ হল ব্যক্তির মধ্যে সংঘটিত গুণগত পরিবর্তন।

পরিণমন (Maturation): পরিণমন হল সুপ্ত জন্মগত ক্ষমতার উন্মেষ। এটি প্রধানত: নির্ভর করে মস্তিস্কের পরিপক্কতা অর্থাৎ মস্তিস্কের আকৃতি, ওজন, বিভিন্ন অংশের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির উপর। মস্তিস্কের পরিপক্কতা সমন্বিত আচরণের মূল কারণ।

বিকাশের সংজ্ঞা:

বিকাশ হল গুণগত পরিবর্তন

বিকাশ হল- *"অগ্রগতিশীল, সুবিন্যস্ত, পর্যায়ক্রমিক এবং সংগতিপুর্ণ পরিবর্তন যা পরিণমন এবং অভিজ্ঞতার দ্বারা সংঘটিত হয়।*

ভ্যান ডেন ডেল (Van Den Dale) এর মতে, বিকাশ গুণগত পরিবর্তন নির্দেশ করে। এর অর্থ হল, "বিকাশ" বলতে একজন ব্যক্তির শুধুমাত্র উচ্চতা কিংবা যোগ্যতার বৃদ্ধি বুঝায় না। এ শব্দটির সাহায্যে দেহজ সংগঠন অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গের কর্মকান্ডের একটি সমন্বিত প্রক্রিয়াকে বুঝায়। প্রাণের সূচনা অর্থাৎ গর্ভধারণ থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত এ রকম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিকাশ সংঘটিত হয়।

বিকাশের ক্ষেত্রে দুটো গুরুত্বপূর্ণ উপাদান প্রভাব বিস্তার করে থাকে, বংশগতি এবং পরিবেশ। বংশগতি হল এমন একটি ধারা বা প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে জীব তার দৈহিক কাঠামো, বর্ণ, চেহারা, ইত্যাদি লাভ করে। পরিবেশ হল অভিজ্ঞতার ব্যাপক বিস্তৃতি। উপযুক্ত পরিবেশে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেয়ার মাধ্যমেই ব্যক্তির কাঙ্খিত বিকাশ সম্ভব। সুপ্ত সম্ভাবনাকে বিকশিত করার জন্য চাই উন্মুক্ত বা উপযুক্ত পরিবেশ। এই দুটো উপাদানই বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এ দুটো প্রক্রিয়াই একে অপরের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত।

আমরা শিশু পরিবেষ্টিত সমাজে বাস করি। সুস্থ স্বাভাবিক শিশু সব মা-বাবার কাম্য। কিন্তু দেখা যায় যে, কিছু কিছু শিশু অন্যান্য সমবয়সীদের মত বেড়ে উঠছে না বা পিছিয়ে রয়েছে। এর কারণ বুঝতে হলে আমাদের সুস্থ স্বাভাবিক শিশুর বিকাশ ধারার বৈশিষ্ট্য ও নীতিগুলো জানতে হবে।

সুস্থ স্বাভাবিক বিকাশমান শিশু কারা?

স্বাভাবিক বিকাশমান শিশু বলতে এমন একটি শিশুকে বোঝায় যে নির্দিষ্ট বয়সে স্বাভাবিক গতিতে পেশী সঞ্চালন, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে সঙ্গতি বিধান, অন্যের সাথে ভাব বিনিময় এবং সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারে। নিচে এরূপ কতগুলি নৈপুন্য বর্ণনা করা হল:

নৈপূণ্যের বর্ণনা:

(ক) পেশী সঞ্চালন ক্ষমতা (Motor Skill): উপুড় হওয়া, বুকে হাঁটা, বসা, উঠে দাড়াঁনো, জিনিস ধরা, সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে নড়াচড়া করা, দেহের ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষমতা এর অন্তর্ভুক্ত।

(খ) পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে সঙ্গতি বিধান (Adaptive Skill): খাওয়া ও স্নান করা, পোষাক পড়তে শেখা, ইত্যাদি দৈনন্দিন ব্যক্তিগত কাজ করে পরিবেশের তাগিদ পূর্ণ করার ক্ষমতা অর্জন অর্থাৎ হাত ও পায়ের যথোপযুক্ত ব্যবহার।

(গ) ভাব বিনিময় (Communicative Skill): অন্যের কথা বুঝে, মৌখিকভাবে অথবা আকার ইঙ্গিতের সাহায্যে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করার ক্ষমতা অর্জন। নিদের্শের অর্থ বুঝে তা পালন করা।

(ঘ) সামাজিক নৈপুণ্য (Social Skill): অন্যের সাথে মেলামেশা করার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা যেমন কাউকে দেখে হাঁসা, অপরিচিত ব্যক্তিকে ভয় পাওয়া, (খুব ছোট শিশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) সমবয়সীদের সাথে খেলা করার নৈপুন্য অর্জন ইত্যাদি।

বিকাশ মনোবিজ্ঞানীদের মতে, উপরোক্ত ক্ষমতাসমূহ বিকাশের স্বাভাবিক ধারার একটি পর্যায়ক্রমিক রূপ। এইগুলির সাহায্যেই নির্ধারণ করা যায় একটি শিশু কতটুকু অগ্রগামী বা

পশ্চাদপদ। ক্ষমতার পর্যায়ক্রমিক পূর্ণাঙ্গ বিকাশ বা পরিপক্কতা নির্ভর করে মস্তিস্কের আকৃতি ও কর্মক্ষমতার উপর। পাঁচ বছর বয়সে শিশুদের মস্তিস্ক প্রাপ্ত বয়সের আকার নেয়। অতএব মস্তিস্কের পরিপক্কতা অর্জন বিকাশের অন্যতম নির্ধারক।

পর্যায়ক্রমিক স্বাভাবিক বিকাশ ধারার বৈশিষ্ট্যসমূহ:

মানুষের বিকাশ ধারায় প্রধানত দুটি প্রক্রিয়া একসাথে কাজ করতে থাকে। যেমন:

(ক) বিবর্তণমূলক প্রক্রিয়া।
(খ) ক্ষয়প্রাপ্তিমূলক ক্রিয়া।

প্রথম জীবনে ক্রমাগত বিবর্তনমূলক প্রক্রিয়া প্রাধান্য পেলেও ক্ষয়জনিত প্রক্রিয়াও কাজ করে থাকে। আবার শেষ জীবনে ক্ষয়িষ্ণু ক্ষয়প্রাপ্তি হলেও (যেমন- স্নায়ুকোষের কর্মক্ষমতা কমে যাওয়া) বর্ধনজনিত প্রক্রিয়াও বিদ্যমান থাকে। যেমন- চুলের বৃদ্ধি পাওয়া, আবার পুরোনো কোষের স্থানে নতুন কোষের জন্ম হওয়া ইত্যাদি।

শিশুর বিকাশ সাধারণত: দুটি নীতি অনুযায়ী বৃদ্ধি পায়। এই দুটি নীতি হল:

- সেফালোকডাল নীতি (Cephalocaudal Principle)।
- প্রক্সিমোডিস্টাল নীতি (Proximodistal Principle)।

সেফালোকডাল নীতি: যে নীতি অনুযায়ী বিকাশ মাথা থেকে শুরু করে পায়ের দিকে যায়। যেমন- শিশুরা পা ব্যবহারের পূর্বে হাত ব্যবহার করতে শেখে।

প্রক্সিমোডিস্টাল নীতি: যে নীতি অনুযায়ী বিকাশ শরীরের কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী অংগে অগ্রসর হয়। যেমন- শিশু তার বুক এবং পেট নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে আগে, তারপর হাত-পা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

- সাধারণত: শিশুর বিকাশ সম্বন্ধীয় পুস্তকে শিশুর বিভিন্ন বিকাশের গড় দেওয়া থাকে।
- ছেলে-মেয়েরা যদি গড়ের চেয়ে নিচে থাকে অনেক বাবা-মা চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাদের মনে রাখতে হবে শিশুর গড় বিকাশের বিন্যাস অনেক বিস্তৃত থাকে, তাই এ ব্যাপারে তেমন চিন্তা করার প্রয়োজন নাই।
- শিশুর মাংশপেশী সঞ্চালনের বিকাশ নির্ভর করে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের পরিপক্কতার উপর।
- সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, পরিবেশ যদি সহায়ক হয় এবং মস্তিস্কে ও শরীর যদি সুস্থ্য থাকে তবে প্রতিটি শিশু তার নিজস্ব গতিতেই বেড়ে উঠবে।

সারমর্ম:
বর্ধন বলতে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধিকে বুঝায়, আর বিকাশ হল, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি ও সে সবের কর্মক্ষমতার সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবর্তন, পরিণমন হল, সুপ্ত জন্মগত ক্ষমতার উন্মেষ। এই তিনটি একে অপরের সাথে একেবারে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিকাশের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারকারী দুটো উপাদান হল: বংশগতি ও পরিবেশ। শিশুর বেশ কিছু ক্ষমতা ও নৈপুণ্য স্বাভাবিক ধারায় বিকাশ লাভ করে। পাঁচ বছরে শিশুর মস্তিষ্ক বড়দের আকার নেয়। শিশুর বিকাশ সাধারণত দুটি নীতি অনুযায়ী বৃদ্ধি পায়।

পাঠ ২.২ শারীরিক বিকাশ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শিশুর জন্মপূর্ব বিকাশ (প্রাক-ভ্রূণকাল, ভ্রূণকাল, পরবর্তী ভ্রূণকাল) সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- জন্ম পূর্বকালে কোন বয়সে কী ধরণের শারীরিক পরিবর্তন হয় তা উল্লেখ করতে পারবেন।

জন্মপূর্ব বিকাশঃ

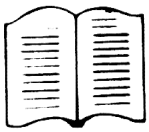

শিশুর জন্মপূর্ব বিকাশকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। যেমন, প্রাক-ভ্রূণকাল, ভ্রূণকাল ও পরবর্তী ভ্রূণকাল। এরমধ্যে প্রথম পর্যায়টি মাত্র ২ সপ্তাহ, দ্বিতীয় পর্যায়টি ৬ সপ্তাহ এবং তৃতীয় পর্যায়টি ৩২ সপ্তাহ স্থায়ী হয়।

প্রকৃতপক্ষে শিশুর জীবন গর্ভধারণের মুহূর্ত হতেই আরম্ভ হয়। স্ত্রী ও পুরুষের জনন কোষ হতে যথাক্রমে ডিম্বকোষ ও শুক্রবীজের মিলনের ফলে স্ত্রীর জরায়ুতে একটি ফলবর্তী ডিম্ব বা Fertilized Egg-এর সৃষ্টি হয়। ক্রমে ডিম্বের মধ্যে কোষ বিভক্তির সাথে সাথে কোষগুলি সুবিন্যস্ত হয়ে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রূপ নেয় এবং মানবদেহের আকৃতির সূচনা হয়। সুতরাং ডিম্বকাল হচ্ছে শিশু বর্ধনের সর্বপ্রথম স্তর। গর্ভ ধারণের (Conception) মুহূর্ত থেকে এ পর্যায় শুরু হয় এবং শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। গর্ভধারণকালের বিস্তৃতি ২৭০ থেকে ২৮০ দিন অর্থাৎ প্রায় নয় মাস হয়।

ফলবতী ডিম্বে ২৩ জোড়া ক্রমোজোম থাকে

ফলবর্তী ডিম্বে বাবা ও মা উভয় হতে ২৩টা করে মোট ৪৬টা ক্রমোজোম এর মিশ্রণ থাকে। এ ক্রমোজোমগুলো হচ্ছে জোড়া সূতাবিশিষ্ট পেচানো এক ধরণের রাসায়নিক উপাদান -এর মধ্যে বংশগতির নক্সা লুক্কায়িত থাকে। সুতরাং শিশু বাবা-মা হতে বংশ সূত্রে কি কি গুণাগুণ লাভ করবে তা জন্ম মুহুর্তেই নির্ধারিত হয়ে যায়। গর্ভধারণের মুহূর্তেই একটি ভ্রূণ মেয়ে হবে না ছেলে হবে তা নির্ধারিত হয়ে যায়। এ ব্যাপারে মা-বাবার ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন প্রশ্ন থাকে না।

জীবনের অন্যান্য বয়সের চেয়ে গর্ভকালে দেহের বৃদ্ধি ও বিকাশ বেশি হয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে নয় মাসে একটি অতি সূক্ষ্ম কোষ বৃদ্ধি পেয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ শিশুতে পরিণত হয়। ৮ সপ্তাহে ভ্রূণ প্রায় ১ইঞ্চি লম্বা হয়, কান মুখ ও চোখের আকার বোঝা যায়। ৮ সপ্তাহ পর ভ্রূণের দেহের বিভিন্ন গ্রন্থি সমূহের গঠন সম্পূর্ণ হয় ও তারা সক্রিয় হয়ে ওঠে। তৃতীয় মাস পূর্ণ হলে হাত পায়ের সঞ্চালন পরিলক্ষিত হয়। ভ্রূণের বৃদ্ধি বর্ধন নীতি অনুযায়ী হয়। যেমন- প্রথমে মাথার বর্ধন সম্পূর্ণ হয় পরে হাত ও পায়ের মাংশপেশীর গঠন সম্পূর্ণ হয় এবং চামড়ার নিচে চর্বির আস্তরণ পড়তে আরম্ভ হয়। ১৬-২০ সপ্তাহে ভ্রূণের বৃদ্ধি দ্রুততর হয়, দৈহিক উচ্চতা ৮-১০ ইঞ্চি হয় এবং ওজন ২০-২২ আউন্স হয়। ৬ মাসের শিশু চোখের পাতা খুলতে ও বুঝতে সক্ষম হয়। ৬/৭ মাসে ভ্রূণ শিশুর মস্তিস্কের বৃদ্ধির সাথে দৈহিক কার্যকলাপও দ্রুতহারে বৃদ্ধি পায়। তার রক্ত চলাচল ও স্নায়ুতন্ত্র গর্ভের বাইরের পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর জন্য তাকে প্রস্তুত করে এবং শিশুর মধ্যে চোষা, চোখের পাতা বোজাসহ অন্যান্য অনুবর্তনমূলক ক্রিয়া আরম্ভ হয়। ৮/৯ মাসে শিশুর মধ্যে

জন্ম প্রস্তুতি চলে। ভ্রূণ শিশুর স্নায়বিক বর্ধন দ্রুত হয়- সেই কারণে অতিরিক্ত কড়া প্রকৃতির ঔষধ বা মাদকদ্রব্য গ্রহণ ইত্যাদি ভ্রূণের স্নায়ুতন্ত্রকে উত্তেজিত করে স্থায়ী ক্ষতিসাধন করতে পারে, নয় মাস শেষে ভ্রূণের দৈর্ঘ্য গড়ে প্রায় বিশ ইঞ্চি হয় এবং ওজন হয় সাত পাউন্ডের মত।

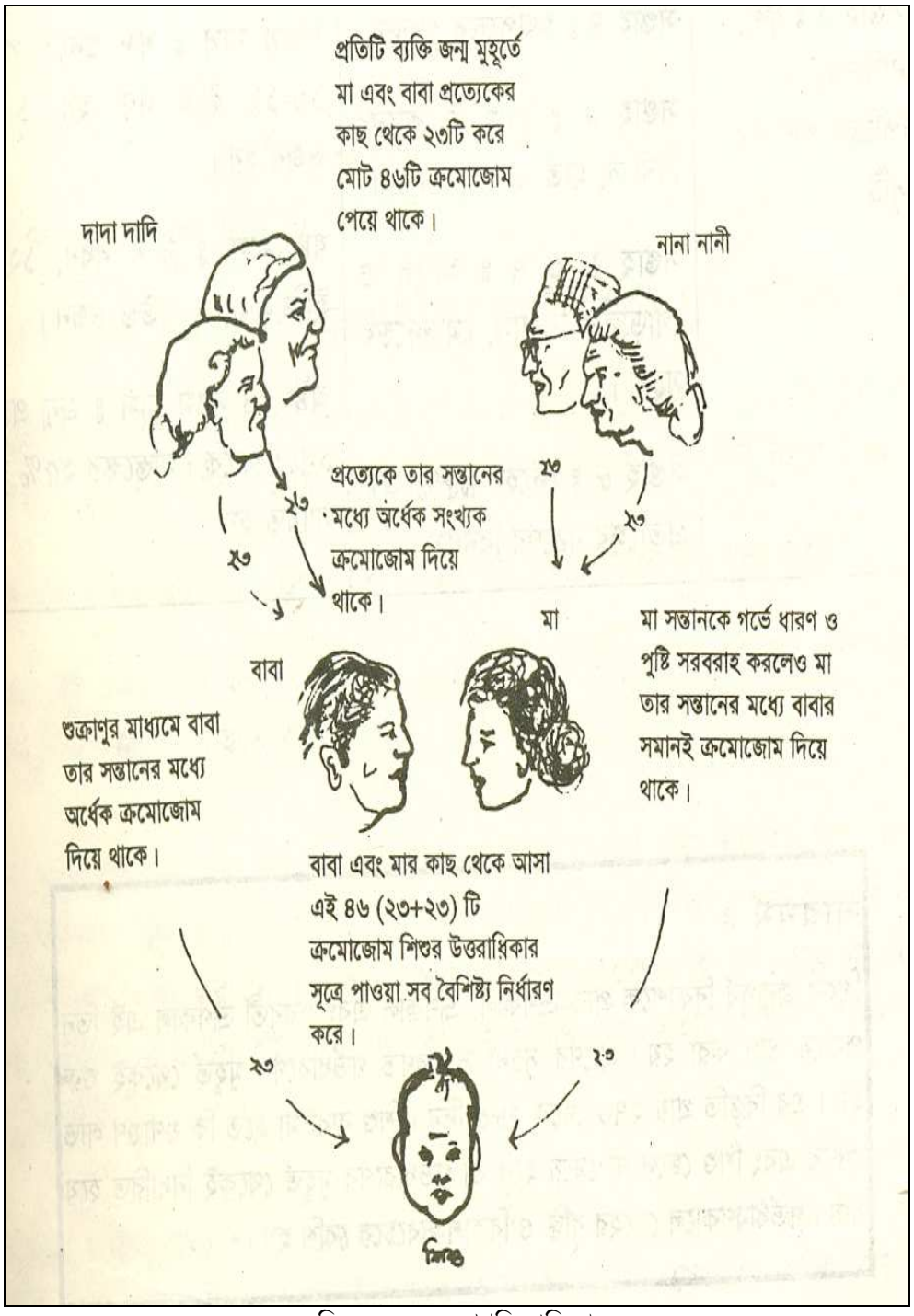

চিত্র ২.২.১: বংশগতি প্রক্রিয়া।

টেবিল নং: ২.১.১ জন্মপূর্ব বর্ধন

ওভাম (Ovum) বা প্রাক-ভ্রূণকাল	Embryo বা প্রাথমিক ভ্রূণকাল	Fetus বা পরবর্তী ভ্রূণকাল
সপ্তাহ ১: ফলবর্তী ডিম্বের জরায়ুতে স্থানান্তর	**সপ্তাহ ৩:** নার্ভের দ্রুত বিন্যাস, কোষ বিভক্তি করণ।	**তৃতীয় মাস:** লিঙ্গের সূচনা **চতুর্থ মাস:** দ্রুত বর্ধন, ভ্রূণ সক্রিয় হয়।
সপ্তাহ ২: ফুল, নাভিরজ্জু ও পিচ্ছিল পদার্থের সৃষ্টি	**সপ্তাহ ৪:** হৃৎপিন্ডের স্পন্দন **সপ্তাহ ৫:** চোখ ও কানের বিন্যাস, হাত ও পায়ের সূচনা **সপ্তাহ ৬ ও ৭:** আঙ্গুল ও গোড়ালীর বিন্যাস, মেরুদন্ডের সূচনা। **সপ্তাহ ৮:** দেহের ৯৫% অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠণের বিন্যাস।	**পঞ্চম মাস:** শব্দ শুনতে পারে। ১০-১২ ইঞ্চি লম্বা হয়, ১ পাঃ ওজন হয়। **ষষ্ঠ মাস:** দ্রুত বর্ধন, ১২-১৪ ইঞ্চি লম্বা, ২ পাউন্ড ওজন। **অষ্টম ও নবম মাস:** জন্ম প্রস্তুতি চলতে থাকে। মস্তিস্কের ২৫% বৃদ্ধি সাধিত হয়।

সারমর্ম:

শিশুর জন্মপূর্ব বিকাশকে প্রাক-ভ্রূণকাল, ভ্রূণকাল এবং পরবর্তী ভ্রূণকাল এই তিন পর্যায়ে ভাগ করা হয়। প্রাণের সূচনা সাধারণত গর্ভধারণের মুহূর্ত থেকেই শুরু হয়। এর বিস্তৃতি প্রায় ২৭০ থেকে ২৮০ দিন। শিশু বাবা মা হতে কি গুণাগুণ লাভ করবে এবং শিশু ছেলে না মেয়ে হবে তা গর্ভধারণের মুহূর্ত থেকেই নির্ধারিত হয়ে যায়। গর্ভধারণকালে দেহের বৃদ্ধি ও বিকাশ সবচেয়ে বেশি হয়।

পাঠ ২.৩ জন্ম পরবর্তীকাল থেকে শৈশব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শৈশবে শিশুর শারীরিক বর্ধণ ও বিকাশ (উচ্চতা, ওজন, দৈহিক কাঠামো, ইন্দ্রিয়ের বিকাশ, পেশী সঞ্চালনমূলক বিকাশ) উল্লেখ করতে পারবেন;
- শিশুর দাঁত ওঠার সময় উল্লেখ করতে পারবেন এবং
- শিশুর বিভিন্ন অঙ্গ প্রতঙ্গের বিকাশের লক্ষণ চিনতে পারবেন।

উচ্চতা ও ওজন:

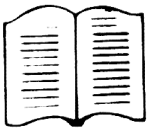

সাধারণত: জন্মের সময় একজন নবজাতকের গড় ওজন থাকে প্রায় ৭$\frac{1}{2}$ পাউন্ডের মত এবং লম্বায় থাকে ২০ ইঞ্চি। শিশু জন্মের পর প্রথম বছরে দ্রুত হারে বাড়ে। ৬ মাসে তার ওজন দ্বিগুণ হয় এবং এক বছরে তিনগুণ হয়। শিশুর উচ্চতা ও ওজনের বৃদ্ধির নমুনা হচ্ছে - ১ বছরে শিশু জন্মের ওজনের ৩ গুণ বাড়ে। উচ্চতা, জন্মের উচ্চতার $\frac{1}{3}$ অংশ বাড়ে। ৫ বছরে শিশু জন্মের ওজনের ৫ গুণ ভারী হয় ও উচ্চতায় দ্বিগুণ হয়। তবে এই গড় ওজন থেকে অনেক শিশুর ওজন ভিন্ন হতে পারে।

শিশুর শারীরিক গঠন এবং আকার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বংশগতির দ্বারা নির্ধারিত হয়। তাছাড়া ব্যক্তির উচ্চতা তার জন্মগত বৈশিষ্ট্য এবং পুষ্টির দ্বারাও প্রভাবিত হয়। অনেকক্ষেত্রে শিশুর ওজন পরিপূর্ণ খাদ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যায় কিন্তু উচ্চতার ক্ষেত্রে তা করা যায় না। শিশুর মানসিক বিকাশের জন্যও পুষ্টি প্রয়োজন। তবে অতি অল্প এবং অত্যাধিক খাবার উভয়ই এর জন্য ক্ষতিকর।

শৈশবে অতিরিক্ত খাদ্য শরীরে মেদবহুল কোষ সৃষ্টি করে। আধুনিক গবেষকরা মনে করেন, শরীরে একবার মেদবহুল কোষ উৎপাদিত হলে সারাজীবন সেগুলো থেকে যায় এবং পরবর্তীতে যে কোন খাদ্য থেকে দেহে মেদ সঞ্চিত হতে থাকে।

প্রত্যেক শিশুর বিকাশের ছন্দ ও বেগ তার নিজস্ব। শিশুতে শিশুতে দৈহিক গঠনের মধ্যে যদিও পার্থক্য দেখা যায় তবুও বয়সের সাথে উচ্চতা ও ওজনের একটা সমতা থাকে যা স্বাস্থ্য পরিমাপের জন্য ব্যবহার করা হয়। চিকিৎসাবিদরা কোন বয়সের ছেলে-মেয়ের কতটা উচ্চতা ও ওজন থাকা স্বাভাবিক তার একটি চার্ট তৈরী করেছেন। এরকম একটি চার্ট নিচে দেওয়া হল:

টেবিল নংঃ ২-৩.১ শিশুর দৈহিক বিকাশের চার্ট

শৈশবের উচ্চতা বৃদ্ধি	
বয়স	উচ্চতা
জন্ম সময়	১৯-২০"
৪ মাস	২৩-২৪"
৮ মাস	২৬-২৮"
১ বৎসর	২৮-৩০"
২ বৎসর	৩২-৩৪"
৫ বৎসর	৩৮-৪০"
শৈশবের ওজন বৃদ্ধি	
বয়স	উচ্চতা
জন্ম সময়	৫.৫ - ৯ পাউন্ড
৪ মাস	১২ - ১৬ পাউন্ড
১ বৎসর	১৮ - ২৪ পাউন্ড
২ বৎসর	২১ - ২৭ পাউন্ড
৩ বৎসর	২৫ - ৩১ পাউন্ড
৫ বৎসর	৩০ - ৪০ পাউন্ড

উৎসঃ (Child Development, Forth Edition, Elizabeth Hurlock International Student Edition).

দেহের বিভিন্ন অঙ্গের বৃদ্ধি

মাথার আকৃতিঃ মায়ের গর্ভে শিশুর বর্ধনে মাথার বৃদ্ধি সর্বোচ্চ হয়। কিন্তু জন্মের পর মাথার বৃদ্ধির গতি কমে আসে। জন্মের সময় দেহের প্রায় অর্ধেক অংশই থাকে মাথা। ১২ বছরে মাথা দেহের

বিভিন্ন অঙ্গ বিভিন্ন হারে বাড়ে

$\frac{1}{8}$ অংশ জুড়ে থাকে এবং ২৫ বছরে মাথা ও মুখ দেহের $\frac{1}{10}$ অংশ হয়। শিশুর মগজ দেহের ওজনের শতকরা ১০ ভাগ হয় এবং জন্মের পর মগজের বৃদ্ধি উলে- খযোগ্য হয়। ৬ বছরে মগজের আয়তন ও গঠন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির মত হয়। শিশুর মাথার উপরের মধ্যবর্তী স্থান নরম থাকে এবং ১২-১৮ মাসে এ নরম স্থান শক্ত হয়।

দাঁত ও মুখের গঠন

সাধারণতঃ ৬/৭ মাসে শিশুর প্রথম দুধ দাঁত বা অস্থায়ী দাঁত ওঠে। বংশগতি, পুষ্টি এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য দাঁত ওঠার সময়কে প্রভাবিত করে। নিচের মাড়ির মাঝখানে প্রথম দুটো দাতঁ ওঠে এবং কিছুদিন পর উপরের মাড়ির মাঝখানে দুটো দাঁত ওঠে।

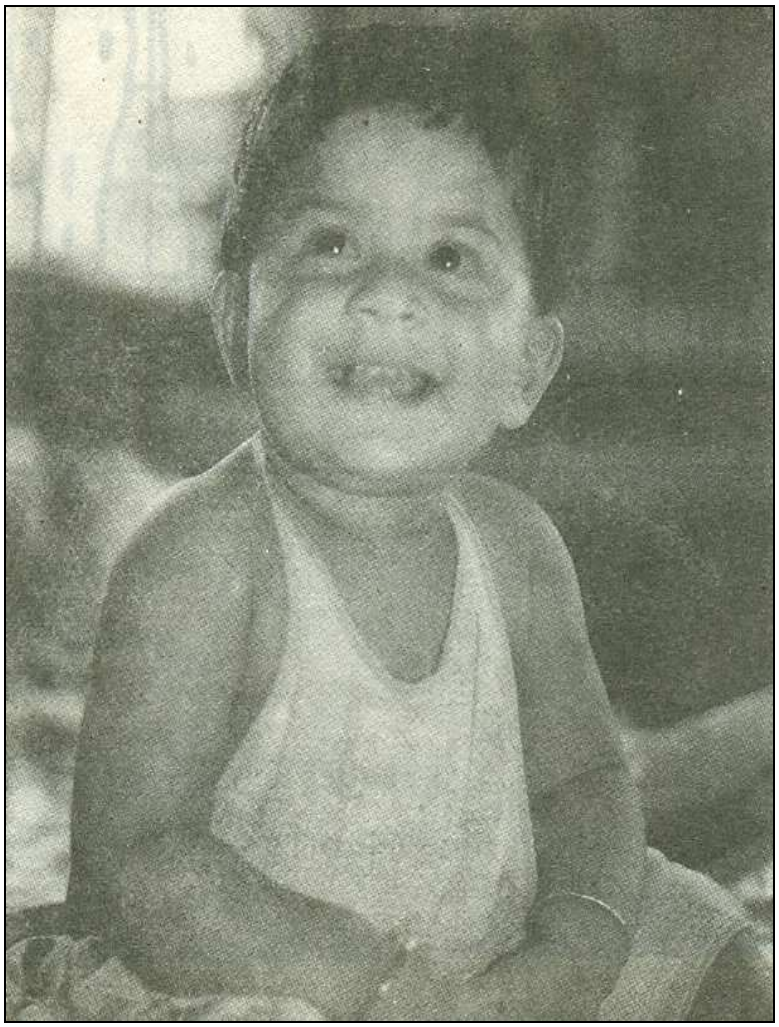

চিত্র ২.৩.১: এক বছর বয়সে শিশুর ৪-৬ টি দাঁত ওঠে।

এক বছরে শিশুর ৪-৬ টি দাঁত ওঠে, দুবছরে ১৬ টি দাঁত হয়। শিশুর দের বছর বয়স হলে বছরে প্রথম মাড়ির দাতঁ ওঠে। ৪/৫ বছরে শিশুর মাড়ির শেষের চারটি দাতঁ ওঠে এবং ৫/৬ বছরে শিশুর প্রথম দুধ দাতঁ পড়ে স্থায়ী দাতঁ ওঠে। এ সময় হতে শিশুকাল পর্যন্ত প্রত্যেক বছরে উভয় চোয়ালে দাতেঁর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

শিশুর ধড়, হাত ও পা

ছোট শিশুকে সাধারণত: মাথা ভারী দেখায়। ক্রমে তার মাথার বৃদ্ধি কমে আসে। ধড়, দেহের নিম্ন অংশ যেমন, হাত-পায়ের বৃদ্ধি দ্রুত হয়। ৬ বছরে শিশুর ধড় জন্ম হতে দ্বিগুণ হয়। ৬-১২ বছরে বড় লম্বাটে হয়, পেট পেশী বহুল হয়।

দুই বছরে শিশুর হাত জন্ম হতে ৫০ - ৬০ ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং ৮ বছরে ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ৭/৮ বছরে হাতের মাংশপেশী বৃদ্ধির ফলে হাতের আকৃতির দৃঢ়তা আসে। পায়ের বৃদ্ধিও হাতের মত দৃঢ় হয়।

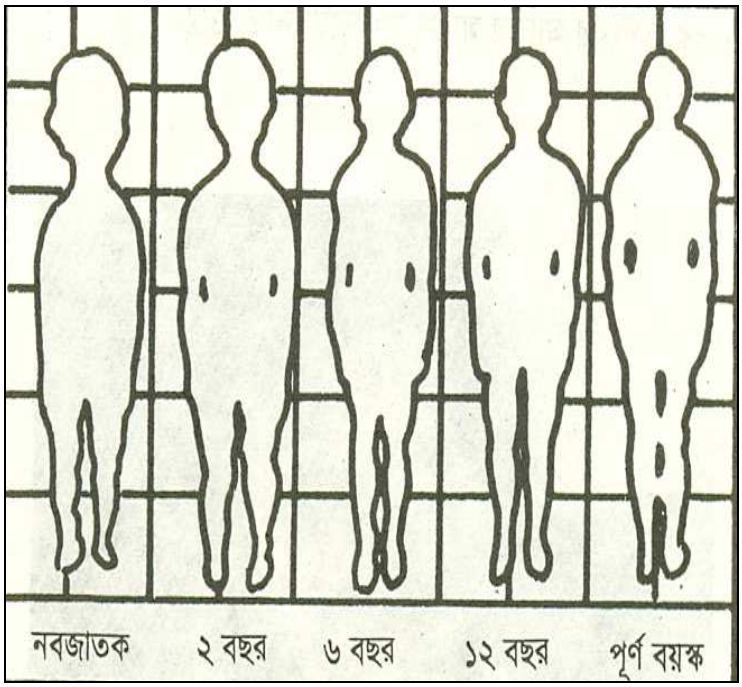

চিত্র ২.৩.২: জন্ম থেকে পূর্ণবয়স পর্যন্ত দেহের অনুপাত।

অস্থি

দু'বছর বয়সে অস্থির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৮ মাসে ৫০ ভাগ শিশুর এবং দু বছরে সব শিশুর মাথার উপরে কোমল অংশ শক্ত হয়। বিকাশের নীতি অনুযায়ী দেহের বিভিন্ন অঙ্গের অস্থি বিভিন্ন মাত্রায় কাঠিণ্য লাভ করে।

মাংশপেশী

দেহের অস্থি বৃদ্ধির সাথে মাংশপেশীরও বৃদ্ধি হয়। ৪ বছরের পর শিশুর দেহের বিভিন্ন পেশী সুদৃঢ় হতে আরম্ভ করে। ৫/৬ বছর হতে দেহের মোট ওজনের চার ভাগের তিন অংশ মাংশপেশীর বৃদ্ধির জন্য হয়। শিশু প্রথমে বৃহৎ পেশীর ব্যবহার (দৌড়-ঝাপ, লাফানো, ডিগবাজী) শিখে ও পরে ধীরে ধীরে সূক্ষ্ম পেশী চালনার ব্যবহার আয়ত্ব করে। ৬ বছর বয়স হতে শিশুর পেশী সঞ্চালন নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে এবং ৭-৮ বছরে শিশু ব্যাট ও বলের সমন্বয় সাধন করতে পারে।

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ক্রমবিকাশের ফলে শিশুর সুক্ষ্ম অঙ্গ সঞ্চালন পরিণতি লাভ করে। ছবি আকাঁ, কাগজ, কাপড় কেটে জিনিস তৈরি করা, আঠা লাগানো, হাতে লেখা, সূচেঁর কাজ ইত্যাদি দক্ষতা আনতে সক্ষম হয়।

দেহের অন্যান্য অঙ্গের মধ্যে হৃদপিন্ড, যকৃত, ফুসফুস, পাকস্থলী উল্লেখযোগ্য। শিশুদের হৃদস্পন্দন বড়দের তুলনায় দ্রুততর হয়। সদ্যজাত শিশুর পাকস্থলীর ধারণ ক্ষমতা প্রায় এক থেকে দেড় আউন্স হয়। ক্রমে শিশুর পাকস্থলীর ধারণক্ষমতা বাড়ে, শিশু কঠিন ও বিবিধ খাদ্যবস্তু হজমে সক্ষম হয়।

ইন্দ্রিয়ের বিকাশ

জন্মের পর পরই শিশুর শ্রবণ, প্রত্যক্ষণ এবং দৃষ্টিগত প্রত্যক্ষণ অনুপস্থিত থাকে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই প্রত্যক্ষণমূলক ক্ষমতাগুলো প্রকাশ পায় শিশুর বিভিন্ন ধরণের প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে। নবজাতক শিশু কাদঁছে, চুষছে, লাথি মারছে, মাথা ঘুরাচ্ছে, এ পাশ থেকে ওপাশ ফিরছে শব্দের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করছে; এ ধরণের বিভিন্ন আচরণ এবং প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে তার প্রত্যক্ষণমূলক ক্ষমতাগুলো বিকাশ ঘটে।

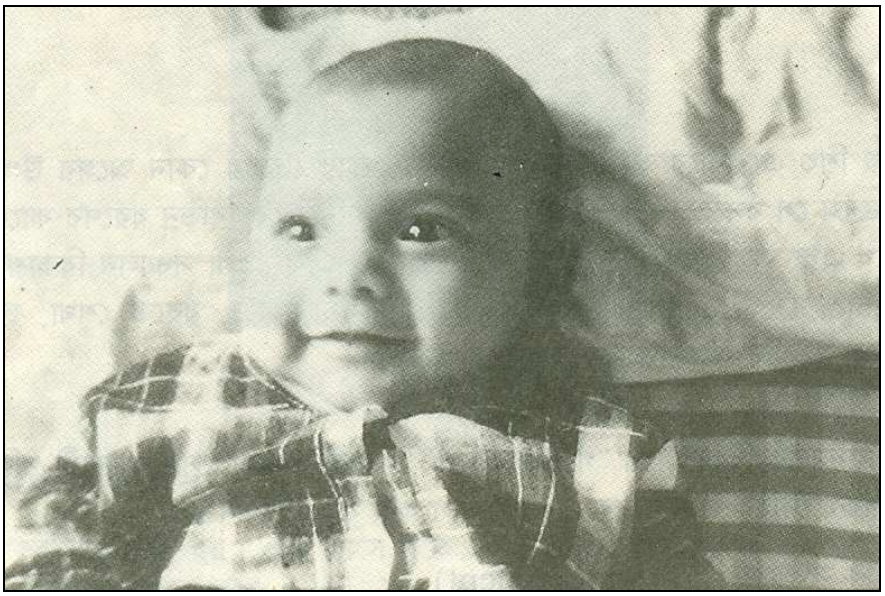

চিত্র ২.৩.৩: তিন মাস বয়সে শিশু পরিষ্কারভাবে দেখতে পায়।

শিশুর দৃষ্টিমূলক প্রত্যক্ষণ খুব সুন্দরভাবে বিকাশ লাভ করে। জন্মের কয়েক ঘন্টা পর পরই নবজাতক আলো এবং আধাঁরে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। জন্ম থেকে দু'মাসের মধ্যেই সে তার দৃষ্টিকে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে, বস্তুকে অনুসরণ করা, বস্তুকে খোঁজা ইত্যাদি বিকাশমূলক ধারা গড়ে ওঠে।

সারমর্মঃ

জন্মের সময় একজন শিশুর ওজন থাকে প্রায় ৭$\frac{1}{2}$ পাউন্ডের মত। জন্মের প্রথম বছরেই শিশুর ওজন দ্রুতবৃদ্ধি হয়। তবে শারীরিক গঠন ও আকার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বংশগতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রত্যেকটি শিশুর বিকাশ তার নিজস্ব গতিতে চলে। শারীরিক বৃদ্ধি ও বিকাশের ধারা সব শিশুর একই ভাবে হয় না। মায়ের গর্ভে শিশুর মাথার বৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি হয়। জন্মের পর এই গতি কমে আসে। জন্মের পর শিশুর দাঁত মুখের গঠন, ধড়, হাত-পা, অস্থি মাংসপেশী ইত্যাদির বিকাশ ঘটে। ৭ বছর বয়সে শিশুর পেশীসঞ্চালন নিয়ন্ত্রিত হয়। কেন্দ্রীয় স্নাতয়ুতন্ত্রের বিকাশের ফলে বিভিন্ন দক্ষতা আয়ত্বে আনে। অন্যান্য অঙ্গের মত শিশুর হৃদপিন্ড, যকৃত, ফুসফুস াকস্থলী ইত্যাদি তার দক্ষতা অর্জন করে। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে শিশুর প্রত্যক্ষণমূলক ক্ষমতাগুলো বিকাশ লাভ করে।

পাঠ ২.৪ পেশীসঞ্চালন মূলক বিকাশ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পেশী সঞ্চালনমূলক বিকাশ কী তা বলতে পারবেন;
- সামগ্রিক ও সূক্ষ্ম সঞ্চালন কী তা বলতে পারবেন এবং
- বিভিন্ন অঙ্গ সঞ্চালনের বিকাশের ধারা ব্যক্ত করতে পারবেন।

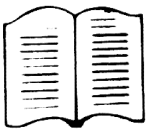

জন্মের সময় শিশু একেবারে অসহায় অক্ষম থাকে। তার দেহের কোন অঙ্গের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না। ক্রমে সে বসতে শিখে, ধরতে শেখে, অর্থাৎ নিজেকে বিভিন্ন ধরণের কাজে ব্যবহার করতে শেখে এবং অঙ্গ সঞ্চালনে দক্ষতা অর্জন করে। একে পেশী সঞ্চালন বিকাশ বা গতীয় বিকাশ (Motor Development) বলা হয়। শিশুর বসা, হাঁটা, ধরতে শেখা, ছবি আকাঁ, খেলাধুলা করা ইত্যাদি অঙ্গ সঞ্চালন বিকাশের অন্তভূক্ত।

"পেশী সঞ্চালনমূলক বিকাশ" বা "গতীয় বিকাশ",- বিকাশ ধারার সূত্র অনুযায়ী পরিণতি লাভ করে। সব রকম দৈহিক সঞ্চালনকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন:

(ক) সামগ্রিক সঞ্চালন (Gross Movement)।
(খ) সূক্ষ্ম সঞ্চালন (Fine Movement)।

সামগ্রিক সঞ্চালনে শিশুর গোটা দেহ সঞ্চালিত হয়। যেমন- দৌড়ানো, হাঁটা, বল ছোড়া, সাতাঁর কাটা, সাইকেল চালানো, লাফানো ইত্যাদি। সূক্ষ্ম সঞ্চালনে শিশুর বিশেষ বিশেষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত হয়, যেমন- সেলাই করা, আকাঁ বা টাইপ করা ইত্যাদি।

শিশুর বিকাশ সমগ্র হতে নির্দিষ্ট হয়

শিশুর এই ধরণের বিকাশ সমগ্র হতে নির্দিষ্ট হয়। শিশু যখন প্রথমে কোন জিনিস ধরতে শেখে তখন সে তার গোটা শরীরকে ব্যবহার করে। ক্রমে সে কেবল তার হাত বাড়িয়ে ধরতে শেখে। শিশু যখন প্রথমে চামচ বা পেন্সিল ধরতে শেখে তখন সে থাবা দিয়ে মুঠো করে ধরে। কিন্তু বয়স বাড়লে ক্রমে সে হাত ও আঙ্গুলের উপর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে। বিভিন্ন বয়সে কিভাবে দেহের অঙ্গ-সঞ্চালন ক্ষমতা বিকাশ লাভ করে, তার বর্ণনা নিচে দেওয়া হল:

দৃষ্টি

জন্মের তিন থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে শিশু দৃষ্টি দিয়ে কিছু অনুসরণ করতে পারে। তিন থেকে চার মাসে চোখ উপর থেকে নিচে এবং আরও কয়েক মাস পর থেকে চোখ চারপাশে ঘুরাতে পারে।

হাসি

তিন চার বছর বয়স হলে শিশু অন্যের হাসি দেখে হাসতে পারে। এর পূর্বে সে অনুবর্তণমূলক হাসি হাসলেও অন্যের হাসির উত্তর দিতে পারে না।

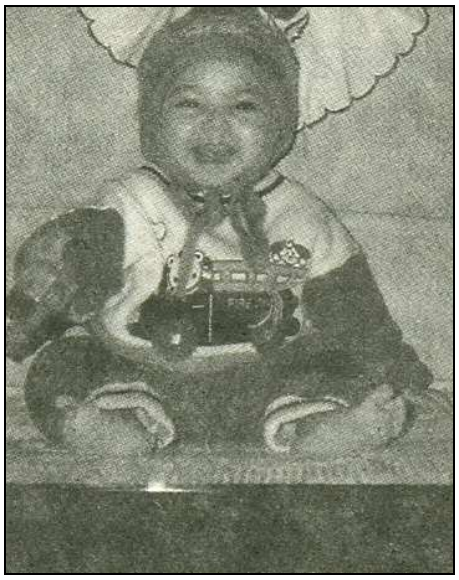

চিত্র ২.৪.১: শিশুর সামাজিক হাসি।

মাথা সোজা করা

দুই মাসে শিশুর ঘাড় শক্ত হয়। ৩/৪ মাসে বুকে ও হাতে ভর দিয়ে মাথা তুলতে পারে। ৫ মাসে চিৎ অবস্থায় মাথা উচুঁ করতে পারে।

দেহকান্ড

জন্মের পর দু'মাস পর্যন্ত শিশুরা নিজেদের দেহকান্ডকে স্বাধীনভাবে নড়াচাড়া করতে পারে না। দুই মাসে কাৎ থেকে চিৎ এবং চার মাসে সম্পূর্ণ উপুড় হতে পারে।

চিত্র ২.৪.২: শিশু নিজে থেকে দাড়াঁতে চেষ্টা করছে।

বসা ও হাটা

চার মাসে শিশু বসতে পারে

চার মাসে শিশু কারো সাহায্যে নিয়ে বসতে পারে। ৬ মাসে সে একা বসতে পারে। ৭-১২ মাসের মধ্যে শিশু হামাগুড়ি দিতে শিখে। সর্বশেষে ৭-১৫ মাসের মধ্যে শিশু হামাগুড়ি দিতে শিখে। আসবাবপত্র ধরে দাড়াঁতে পারে ৯ মাসে এবং ১১ মাসে একা দাঁড়াতে শিখে। ধীরে ধীরে সাহায্য নিয়ে হাটা শিখে ১২ মাসে। বিকাশের এই ধারা নীচে চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল:

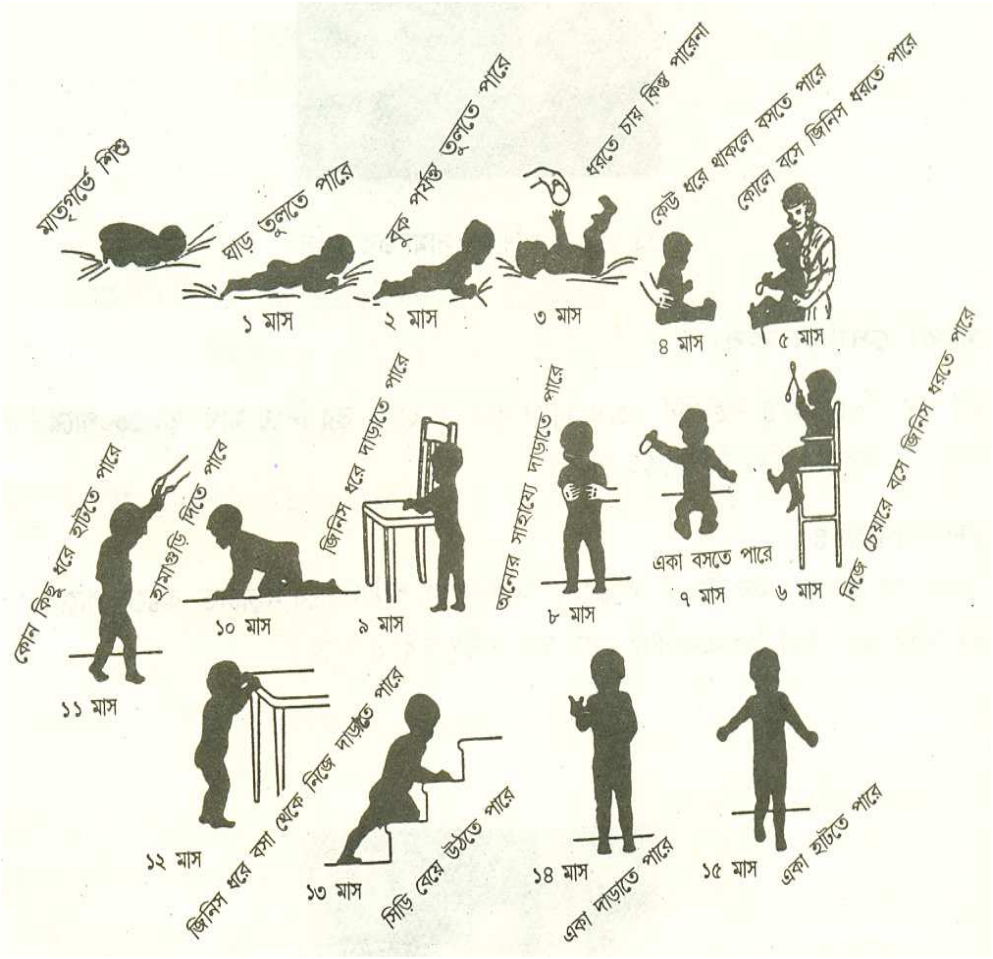

চিত্র ২.৪.৩: শিশুর সঞ্চালনমূলক বিকাশ।

হাত দিয়ে ধরা

শিশু ৪ মাস বয়সে কোন জিনিস দেখে ধরতে পারে না। ৫ মাসে থাবা দিয়ে ধরার ক্ষমতা অর্জন করে। ৮-১০ মাস বয়সে প্রতিটি বস্তু হাত দিয়ে ধরতে পারে এবং নীচ থেকে জিনিস তুলতে পারে। এক বৎসরের শিশু থাবা দিয়ে পেন্সিল ধরতে পারে, ২ বছরে বাক্স খুলতে, বই এর পাতা উল্টাতে, বৃত্ত আকাঁ কাপড় খুলা, হাতমুখ ধোয়া, ইত্যাদি কাজগুলো পারে। ৫ বছরে সে কিছু আকঁতে শেখে এবং অন্যান্য দক্ষতার অনেক উন্নতি হয়।

শৈশবেই শিশু পূর্ণ দৈহিক নিয়ন্ত্রণ পায়

শৈশবকালের মধ্যেই শিশুর দেহ তার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এসে যায় এবং বিভিন্ন নৈপুণ্যের বিকাশ ঘটে। লঘু মস্তিষ্ক হচ্ছে সঞ্চালনমূলক শক্তির কেন্দ্র। জন্মের সময়ের অপরিণত মস্তিস্কের আস্তে আস্তে বিকাশ লাভ শুরু করে। ৫ মাস থেকে ২ বছরের মধ্যে লঘু মস্তিস্ক সম্পূর্ণভাবে গড়ে ওঠে। ফলে অসহায় শিশু ২ বছর বয়সে স্বাধীনভাবে শরীর সঞ্চালন করতে সক্ষম হয়।

বড়দের সাহায্য ও উৎসাহ এবং খেলাধূলার সরঞ্জাম শিশুর বসা, দাড়ানো, হাটা ইত্যাদি সব সঞ্চালনমূলক কাজকে তরান্বিত করে।

সারমর্মঃ

শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের কাজেরও বিকাশ ঘটে। শিশুর বসা, হাঁটা, ধরা, ছবি আঁকা এগুলো সবই সঞ্চালনমূলক বিকাশ। শিশু ২ বছর বয়সে স্বাধীনভাবে শরীর সঞ্চালন করতে সমর্থ হয়। এই বিকাশ কতগুলো নীতি মেনে চলে। বিকাশ সমগ্র থেকে বিশেষের দিকে, বড় পেশী থেকে ছোট পেশীতে উপর থেকে নিচে এবং কাছে থেকে দূরের দিকে অগ্রসর হয়। বিকাশের ধারায় ব্যক্তি পার্থক্য থাকে। সঞ্চালনের বিকাশধারা সমহারে এগিয়ে চলে। শৈশবকালের মধ্যেই শিশুর দেহ তার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রনে আসে এবং বিভিন্ন নৈপুণ্যের বিকাশ ঘটে থাকে।

পাঠ ২.৫ বাল্যকালের শারীরিক বিকাশ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাল্যকালে শারীরিক বিকাশের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- ছেলে-মেয়েদের উচ্চতা ও জ্ঞান বৃদ্ধির ধারা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- বিভিন্ন ধরণের দৈহিক গড়ন সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- বাল্যকালে ছেলে-মেয়ের বিকাশের পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- এই সময়ে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গর বৃদ্ধির অনুপাত বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- এই সময়ে পেশীয় দক্ষতার বিকাশ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাল্যকাল

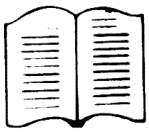

সাধারণত: ছয় বছর থেকে ১১/১২ বছর পর্যন্ত সময়কে বাল্যকাল বলা হয়। বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী হারলকের মতে, দু'বছর থেকে শুরু করে যৌন পরিপক্কতা অর্জনের পূর্ব পর্যন্ত সময়কে বাল্যকাল বলা যেতে পারে। বাল্যকাল জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ সময় জীবনের অনেক পরিবর্তন ঘটে। শৈশবের সঙ্গে বাল্যের অনেক পার্থক্য। শৈশবে সব কিছুই অসংহত থাকে। কিন্তু বাল্যে সমস্ত বিকাশে একটি শৃংখলা দেখা যায়। এ সময় শিশুরা যেন অধিক পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

দৈহিক বিকাশ

এই বয়সে শিশুদের দৈহিক বা শারীরিক বৃদ্ধি প্রথমদিকে খুব ধীরগতিতে চলে। যেমন- পাচঁ বছর ও ছয়/সাত বছরের শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধি ও বিকাশের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য তেমন কোন পার্থক্যই দেখা যায় না। তথাপি দৈহিক বিকাশের প্রধান প্রধান দিকগুলোর নিচে দেয়া হল-

উচ্চতা

এ সময়ে শিশুরা গড়ে উচ্চতায় দুই থেকে তিন ইঞ্চি করে বাড়ে। যখন স্কুলে যেতে শুরু করে তখন উচ্চতা প্রায় সাড়ে তিন ফুট হয়। এই সময় বিকাশের মাত্রা খুব কম হলেও বিকাশের হার মোটামুটি নির্দিষ্ট গতিতে চলে।

ওজন

শারীরিক ওজন বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও ধীরগতি লক্ষ্য করা যায়। ওজন বছরে গড়ে ৩-৫ পাউন্ড বৃদ্ধি পায়। ছয় বছরে শিশুদের ওজন জন্ম সময়ের ওজনের প্রায় সাতগুণ বেশি হওয়া প্রয়োজন। তবে বাল্যকালে সব সময় ওজন এক হারে বৃদ্ধি পায় না। উচ্চতা ও ওজন উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য দেখা যায়।

দেহের গড়ন

দেহের গড়নের পার্থক্য সবচেয়ে প্রথম ধরা পড়ে শৈশবে। মনোবিজ্ঞানীরা সাধারণত: তিন ধরণের দৈহিক গড়নের কথা বলেন। এগুলো হল:

(ক) এন্ডোমরফিক (Endomorphic)– নাদুসনুদুস গড়ন।

(খ) মেসোমরফিক (Mesomorphic)– বলিষ্ঠ দেহ।

(গ) এক্টোমরফিক (Ectomorphic)– ছিপছিপে গড়ন।

এন্ডোমরফিক: এই গড়নের শিশুদের পেট স্ফীত হয় এবং দেহ গোলগাল ও মোটা হয়।

মেসোমরফিক: এ সব শিশুর দেহ বলিষ্ঠ ও সুগঠিত হয়।

এক্টোমরফিক: এই শ্রেণির শিশুর দেহ দীর্ঘ ও ক্ষীণ হয়। পেশী ততবেশি সুগঠিত হয় না।

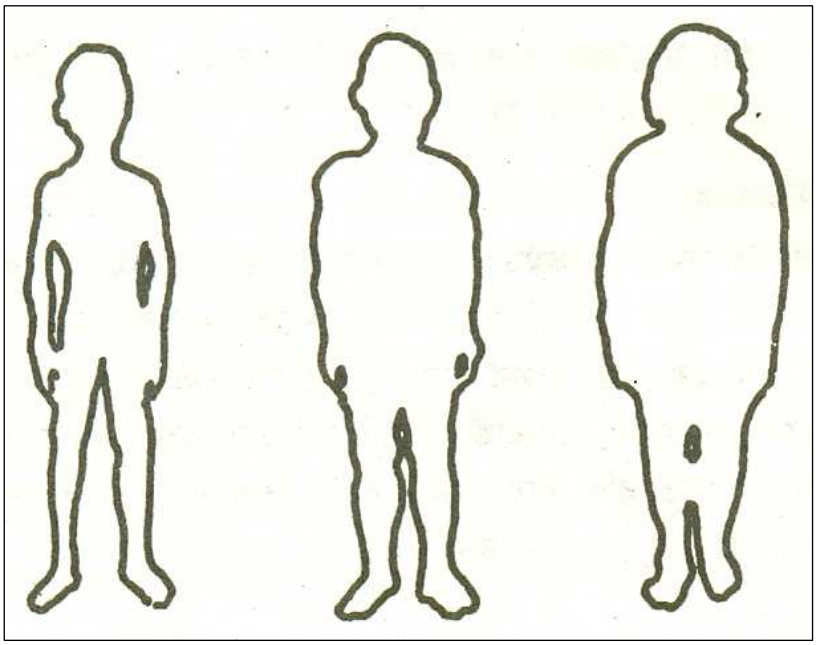

এন্ডোমরফিক মেসোমরফিক এক্টোমরফিক

চিত্র ২.৫.১: তিন ধরনের দৈহিক গড়নের শিশু।

দাতঁ

প্রায় ৬ বছর বয়স থেকেই শিশুর দাঁত পড়তে শুরু করে। অস্থায়ী দাঁত পড়ে স্থায়ী দাঁত ওঠে। সামনের সারিতে প্রথম দাঁত ওঠে। ১২/১৩ বছরের শিশুর স্থায়ী মোট বত্রিশটি দাঁতের মধ্যে আঠাশটি দাঁত উঠে যায়।

ছেলে ও মেয়ের বিকাশে পার্থক্য

ছেলের বিকাশ মেয়েদের চেয়ে ধীর

বাল্যকালে শারীরিক বিকাশের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ছেলে ও মেয়ের বিকাশের পার্থক্য। এ সময়ে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের বিকাশ একটু বেশি হয়। মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে আগে যৌনতা প্রাপ্ত হয়ে থাকে। কিন্তু পরবর্তীতে আবার ছেলেরা মেয়েদেরকে ওজন ও উচ্চতায় অতিক্রম করে যায়। উচ্চতা ও ওজন স্বাভাবিক নিয়মে বংশগতি ও আর্থসামাজিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। সাধারণত ছেলেমেয়েরা পূর্ণ বয়সের ওজন ও উচ্চতার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ এই স্তরে অর্জন করে।

দৈহিক বৃদ্ধির অনুপাত

বাল্যকালে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বৃদ্ধির অনুপাত শৈশবের অনুপাতের চেয়ে ভিন্ন। দেহের অনুপাতে মাথার আকৃতি হয় ছোট। ৬ -১২ বছরে দেহ লম্বাটে আকার ধারণ করে। তলপেটের ফোলাভাব কমে যায় ও পেট পেশী বহুল হয়। কপাল সমান হতে থাকে। ঠোঁট পুষ্ট হয়। নাক লম্বা হয়ে যথার্থ আকার ধারণ করে। শিশু সুলভ চেহারার পরিবর্তন ঘটে।

গলার আকৃতির পরিবর্তন হয়। গলা সরু ও লম্বা হয়। ৭/৮ বছরে হাতের মাংসপেশী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে আকৃতি দৃঢ় ও প্রশস্ত হয়। পায়ের বৃদ্ধিও হাতের মত হয়। হাতের আঙ্গুলের বৃদ্ধি ৫/৬ বছর হতে দ্রুত হয়।

দশ বছর বয়সের মধ্যে মস্তিস্কের পরিপক্কতা ঘটে। দেহের মধ্যে সূক্ষ্মপেশীগুলো পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করে। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ম হয়।

পেশীজ ক্ষমতা

পেশী শারীরিক কর্মক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে

পেশীর দক্ষতা শারীরিক সমস্ত কর্মক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। জন্মের সময় থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিভিন্ন পেশীর বিকাশ হতে থাকে। ৫/৬ বছর থেকে দেহের মোট ওজনের ৩/৪ অংশ মাংশপেশীর বৃদ্ধির জন্য হয়। ছয় বৎসর বয়স হতে পেশী সঞ্চালন নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। এই সময়ে তারা দৌড়ানো, লাফানো, ডিগবাজী প্রভৃতি সামগ্রিক অঙ্গ চালনা করতে পারে এবং এ ধরণের কাজের ক্ষমতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ৭-৮ বছরে শিশু ব্যাট ও বলের যোগাযোগ করতে পারে। ৮-১০ বছরে তাদের চলাফেরায় ছন্দ ও নৈপুণ্য দেখা যায়।

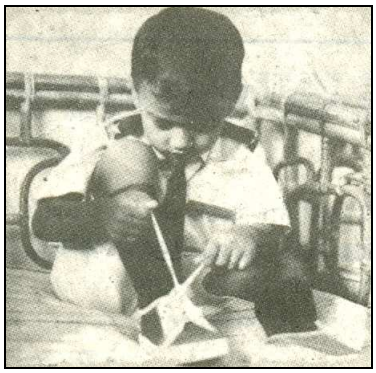

চিত্র ২.৫.২: শিশু নিজে জুতার ফিতা বাঁধছে।

এই সময় হাতে ও আঙুলের পেশীর দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। কেন্দ্রিয় স্নায়ুতন্ত্রেরও ক্রমবিকাশ ঘটে। ফলে শিশু সূক্ষ্ম অঙ্গসঞ্চালনে সমর্থ হয়। ছবি আকাঁ, কাগজ কাপড় কেটে জিনিস তৈরী করা, সেলাই করা ইত্যাদি কাজ করতে শিশুরা সক্ষম হয়। বলা বাহুল্য যে, শিশু সাধারণ বিকাশ নিয়মের অন্তর্ভূক্ত থেকেও সব সময় একই হারে বাড়ে না। শিশুর শারীরিক পরিবর্তনে ব্যক্তিগত পার্থক্য সব সময় থাকে।

ভাল স্বাস্থ্য ও উন্নত মানের পুষ্টি শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশে অবদান রাখে। প্রত্যেক বয়সে শিশুর স্বাস্থ্য যত ভাল থাকবে এবং পুষ্টিকর খাবার খাতে তত তাড়াতাড়ি দৈহিক বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্পন্ন হবে। এছাড়া পর্যাপ্ত খেলাধুলা, ব্যায়াম শিশুর শারীরিক বিকাশে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। দেহের বৃদ্ধিতে সবচেয়ে বেশি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে পুষ্টিহীনতা।

সারমর্মঃ

ছয় থেকে এগারো/বার বছর বয়স পর্যন্ত সময়কে বাল্যকাল বলে। এই সময়কালটা জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময় শারীরিক বিকাশ খুব ধীরগতিতে হয়। গড়ে বছরে ২-৩″ উচ্চতা ও ৩-৬ পাউন্ড ওজন বাড়ে। তবে উচ্চতা ও ওজন উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য দেখা যায়। শৈশবেই শিশুদের দৈহিক গড়নটা ধরা পড়ে। বাল্যকালে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের বৃদ্ধি বেশি হয়। এ সময়ে সব অঙ্গের বৃদ্ধি একইভাবে হয় না বলে দেহ অসামঞ্জস্যপূর্ণ আকৃতির হয়। হাত ও পা প্রশস্ত হয়। দেহের সূক্ষ্মপেশীগুলোর পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করে। ফলে পেশীর দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। ভাল স্বাস্থ্য ও উন্নত মানের পুষ্টি শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। দেশের বৃদ্ধিতে সবচেয়ে বেশি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে পুষ্টিহীনতা।

পাঠ ২.৬

জ্ঞানীয় বিকাশ: শৈশব থেকে কৈশোর

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পিয়াঁজের জ্ঞান বিকাশের মূল ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন;
- পিয়াঁজের জ্ঞানীয় বিকাশ সম্পর্কিত মতবাদের বিভিন্ন স্তরগুলো বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিক্ষাক্ষেত্রে পিয়াঁজের মতবাদ প্রয়োগের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

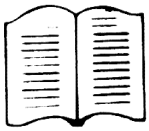

ছোট শিশু যেমন উচ্চতায় ও ওজনে বাড়ে তেমনি তার মনটাও বাড়ে। সে কথা বলতে শিখে ও চিন্তা করতে শিখে। যেহেতু মানসিক বিকাশ শিশুর চলাফেরায়, কথায় ও অন্যান্য আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়, তাই শারীরিক বিকাশের মত মানসিক বিকাশও চেষ্টা করলে সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায়। মানসিক ক্ষমতার বিকাশের জন্য শৈশব ও বাল্যকাল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ সময়ই শিশুর চিন্তার বিকাশ ঘটে। শিশুর মানসিকতা বিশেষ করে চিন্তাশক্তির বিকাশ সম্পর্কে সুইস মনোবিজ্ঞানী জ্যা পিয়াঁজের অবদান উল্লেখযোগ্য। তিনি শিশুর জ্ঞানীয় বিকাশের উপর একটি তত্ত্ব তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, শিশুর জ্ঞানের বিকাশ মূলত: পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর এক যোগ্যতা। শিশু এই যোগ্যতা লাভ করে পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনার সাথে পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে।

বুদ্ধি পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর এক বিশেষ ক্ষমতা

পিয়াঁজের মতে, শিশুর চিন্তায় দুটো মানসিক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়- একটি হচ্ছে 'ৎবধষরংস' অর্থাৎ বাস্তবতা এবং অন্যটি হচ্ছে 'Animism' অর্থাৎ সচলতা। উভয় বৈশিষ্ট্য শিশুর আত্মকেন্দ্রিকতা হতে বিকশিত হয়। পিয়াঁজে শিশুর ভাবনা চিন্তাকে কেন্দ্র করে তার মানসিক ও বুদ্ধি বিকাশের উপর অনেক গবেষণা ও পরীক্ষা-নীরিক্ষা করেন। তাঁর মতে, বুদ্ধি হচ্ছে, পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর এক বিশেষ ক্ষমতা বা Adaptation। পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে যেয়ে দুটো বিষয়ের সমন্বয় সাধন হয়। এই দুটো বিষয় হল:

(ক) আত্তীকরণ (Assimilation) বা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করা।

(খ) সহযোজন (Accommodation) পূর্বের ধারণার মধ্যে স্থান দেওয়া বা খাপ খাওয়ানো

জ্ঞান বিকাশের স্তরসমূহ

জন্মের পর থেকেই শিশু তার জ্ঞানের বিকাশ সাধনের কাজে ব্রতী হয় তবে পিয়াঁজের মতে এই প্রক্রিয়া সারা জীবন ব্যাপী চলে না বরং তা কৈশোরকাল পর্যন্ত গিয়ে স্থির হয়ে যায় অর্থাৎ জ্ঞানের কাঠামোগত আর কোন পরিবর্তন হয় না।

পিয়াঁজে মানুষের জীবনকে তার জ্ঞান বিকাশের দৃষ্টিকোণ থেকে মোট চারটি সময়কালে ভাগ করেছেন। তবে এই সময়কালের একেবারে ধরাবাধা নিয়ম নেই। কারো কারো ক্ষেত্রে বয়সের তারতম্য ঘটতে পারে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে, সবাইকেই এই স্তরগুলি একে একে অতিক্রম করতে হয়, কোনটি বাদ দিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না।

জ্ঞান বিকাশের স্তরগুলো হল

(ক) ইন্দ্রিয় পেশীর সমন্বয় কাল (Sensorimotor Period)।

(খ) প্রাক প্রায়োগিক কাল (Pre-Operational Period)।

(গ) বাস্তব প্রায়োগিক কাল (Concrete Operational Period)।

(ঘ) রীতিবদ্ধ প্রায়োগিক কাল (Formal Operational Period)।

নিচে এই স্তরগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল:

ইন্দ্রিয় পেশীর সমন্বয়কাল

জন্ম থেকে দুই বৎসর বয়সকাল পর্যন্ত ইন্দ্রিয় পেশীর সময়কাল পরিব্যপ্ত। এই সময় শিশু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাড়াচাড়ার মাধ্যমে পৃথিবীকে বুঝতে শিখে। পিয়াঁজে তাঁর নিজের তিন সন্তানকে পর্যবেক্ষণ করে শিশুর জ্ঞানীয় বিকাশের এই স্তরগুলো তুলে ধরেন। এই ইন্দ্রিয় পেশীর সমন্বয়কালকে আবার ৬ ভাগে ভাগ করা হয়। নিচের ছকে বিভিন্ন ভাগ এবং বয়স অনুযায়ী তার আচরণের বিবরণ দেয়া হল।

পর্ব	আনুমানিক বয়স	আচরণের বিবরণ
প্রথম স্তর	০-১ মাস	স্নায়বিক প্রতিবর্ত ক্রিয়া প্রদর্শন, যেমন- চোষা, ধরা এবং এগুলোর উপর ভিত্তি করে দক্ষতা লাভ হয়।
দ্বিতীয় স্তর	১-৪ মাস	সরল আচরণের পুনরাবৃত্তি, যেমন- আঙ্গুল দিয়ে কোন বস্তু নাড়াচাড়া করা, দুটো আচরণের সমন্বয় সাধন। যেমন- দেখে ধরা।
তৃতীয় স্তর	৪ - ৮ মাস	শিশুকে সুখী করে এমন আচরণের পুনরাবৃত্তি করা, যেমন- খেলনাকে বাড়ি দিয়ে শব্দ করা।
চতুর্থ স্তর	৮ -১২ মাস	লক্ষ্য অর্জন করার জন্য আচরণের প্রদর্শন, যেমন- টেবিলের কাপড় টেনে উপরের বস্তু লাভ করা, কোন অনুপস্থিত বস্তুকে খোঁজার আগ্রহ ইত্যাদি।
পঞ্চম স্তর	১২ - ১৮ মাস	ত্রুটি ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান, যেমন- চাদরের নিচে খেলনা থাকলে চাদর তুলে খোঁজার প্রচেষ্টা।
ষষ্ঠ স্তর	১৮-২৪ মাস	শিশু বহুলাংশে তার মধ্যে জ্ঞানীয় দক্ষতার বিকাশ সাধন করে। শব্দ শুনে বস্তু দেখতে পারে এবং আধো শব্দ ব্যবহার করে অনেক রকম মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে।

চিত্র ২.৬.১: প্রতিবর্ত ক্রিয়া: শিশুর গালে কিছু ছোয়ালে শিশু তা মুখে পুরার চেষ্টা করে।

এই ৬টি স্তরের মধ্য দিয়ে শিশুর বস্তু সম্পর্কে ধারণার উন্নতি হয়। শিশু নিজেকে বস্তু হতে পৃথক করে ভাবতে শিখে এবং বস্তুর স্থায়িত্ব সম্পর্কে (Object Permanence) অবগত হয়। অর্থাৎ চোখের আড়াল হলেই যে বস্তুটি হারিয়ে যায় না, তা উপলব্ধি করে। শিশু বিশেষ বিশেষ বস্তু নির্দেশ করতে শিখে এবং বস্তুকে লক্ষ্য করে ওটাকে পাবার জন্য সক্রিয় হয়ে থাকে।

প্রাক প্রায়োগিক কাল

দুই থেকে সাত বছর পর্যন্ত সময় হল প্রাক প্রায়োগিক কাল। পিয়াঁজে এই সময়কে আবার দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন- প্রাক ধারণার স্তর (Pre-Conceptual Stage) এবং উপলব্ধির স্তর (Peroid of Intutive Thought)।

প্রাক ধারণার স্তর (২ থেকে ৫ বৎসর)

এ সময়ে শিশুর চিন্তায় প্রতীক এবং চিহ্নের (Symbolism) ব্যবহার আরম্ভ হয়। এ বয়সে শিশুর মধ্যে প্রতীকময় খেলনা বা Symbolic Play বেশ দেখা যায়।

এই পর্বের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে

১. বিশেষ হতে সাধারণ চিন্তা (Inductive Thought): যেমন- শিশু নতুন পরিস্থিতিকে অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্লেষণ করে। পিয়াঁজের ২৯ মাস বয়সের কন্যা বাথরুমে তার বাবাকে গরম পানির কল ছাড়তে দেখে দাঁড়ি কামাবার কথা অনুমান করলো, কারন অতীতে সে তার বাবাকে এরূপ আচরণ করতে দেখেছে।

২. সাধারণীকরণের অভাব (Lack of Generality): শিশুর চিন্তা ভাবনায় কেবলমাত্র বিশেষ বস্তুর স্থান থাকে, কোন শ্রেণিকরণ বা বিভাগের ধারণা থাকে না।

৩. আত্মকেন্দ্রিকতা (Egocentricity): শিশু সবকিছুকে তার মত করে তার দিক হতে বিবেচনা করে। যেমন আমার মা, আমার বাবা, আমার খেলনা ইত্যাদি। কিন্তু এগুলি যে অন্যের হতে পারে তা সে বুঝতে পারে না।

৪. কেন্দ্রীকরণ (Centration): এই সময়ে শিশু কোন ঘটনার বা বস্তুর পরিবর্তনকে বুঝতে পারে না। পিয়াঁজের বিখ্যাত একটি পরীক্ষায় এই জাতীয় বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। যেমন- একই মাপের দুটো চোঙে একই পরিমান পানি এই বয়সের শিশুর কাছে সমান বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু একটা চোঙের পানি যদি অপর একটা সরু লম্বা চোঙে ঢালা হয় তাহলে পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ায় শিশু ঐ চোঙে বেশি পানি আছে বলে বলবে। অর্থাৎ যেটা দেখতে বড় সেটাই বেশি বলে ধারণা হবে। কিন্তু ৬/৭ বছরের পর শিশুর এই একতরফা চিন্তার পরিবর্তন আসে।

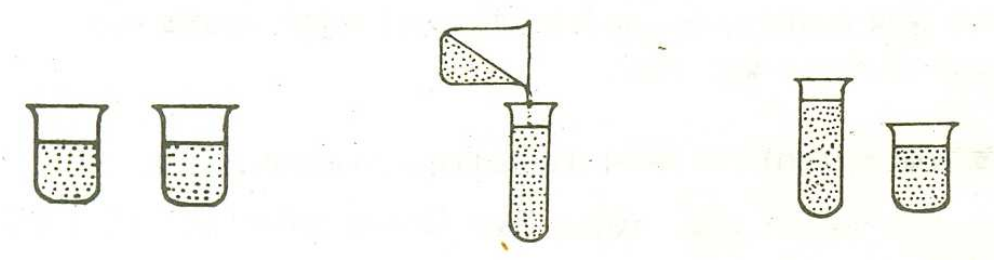

ধাপ- ১: দু'টি গ্লাসে সমপরিমাণ পানি আছে বলে শিশু জানায়।

ধাপ- ২ : শিশুর সামনে একটি গ্লাসের পানি ভিন্ন আকৃতির অপর গ্লাসে ঢালা হল।

ধাপ- ৩: শিশুকে দু'টি ভিন্ন আকৃতির গ্লাসের পানির মধ্যে তুলনা করতে বলা হল।

চিত্র ২.৬.২: প্রাক-প্রায়োগিক কালে শিশু লম্বা গ্লাসে বেশি পানি আছে বলে জানায়।

উপলব্ধির কাল (Period of Intutive Thought)

এ সময়ে অর্থাৎ ৫-৭/৮ বছরে শিশুর চিন্তা কিছুটা সু-সংগঠিত ও যুক্তিপূর্ণ হয়। পিয়াঁজের চিন্তায় এ বয়সের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। যেমন:

শিশু যা দেখে তাই বিশ্বাস করে, অন্যের দৃষ্টিকোণ থেকে উপলব্ধি করতে পারে না। শিশু কেবলমাত্র একটি বিষয়ের প্রতি (Centration) খেয়াল করতে পারে। যেমন- একটি মালায় লাল রঙের পুঁতি থাকতে পারে, আবার পুঁতিগুলো কাঠের তৈরীও হতে পারে। এ দুটো বিষয়কে শিশু একসাথে চিন্তা করতে পারে না।

বাস্তব প্রায়োগিক কাল (Concrete Operational Period):

বাস্তব প্রায়োগিক কালকে চিন্তার অনুভূতি স্তরও বলে। সাধারণত ৭ বছর বয়স থেকে বাস্তব প্রায়োগিক কালের সূচনা হয়। এই স্তরে শিশুদের মধ্যে যৌক্তিক চিন্তার বিকাশ ঘটে। পিয়াঁজে এই স্তরের তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। এগুলো হল:

বিকেন্দ্রীকরণ (Decentration): শিশু এখন সমগ্র এবং সমগ্রের সাথে জড়িত অংশগুলির প্রতি মনোযোগ দিতে শিখে। দেখতে বড় হলে যে ওজনে ভারী হবে তা শিশু এখন বিশ্বাস করে না।

বিপরীতমুখীতা (Reversibility): বিকেন্দ্রীকরণের ফলে শিশু বিপরীতমূখী চিন্তা করতে সক্ষম হয় এবং একই সময়ে দুটো জিনিসের প্রতি মনোযোগ দিতে পারে অর্থাৎ কোন বস্তুর আকারের পরিবর্তন হলেও তার পরিমাণ একই থাকতে পারে এটা শিশু এখন বিশ্বাস করতে পারে।

সংরক্ষণ জ্ঞান (Conservation): প্রাক প্রায়োগিক কালের শিশু লম্বা গ্লাসে বেশি পানি আছে বলে জানায়। কিন্তু বাস্তব প্রায়োগিক কালের শিশুর সংরক্ষণের ধারণা জন্মেচ্ছে বলে সে দুটি গ্লাসে সমপরিমান পানি আছে বলে জানায়।

এই পর্বে আরো দুটো গুণের বিকাশ ঘটে, যেমন শ্রেণিকরণ (Classification) এবং অনুক্রমিক সাজানোর নিয়ম (Serial Ordering)। শিশু বেশি ও কম অনুযায়ী সাজাতে শেখে, বৃহত্তম, ক্ষুদ্রতম ইত্যাদি ধারণাও অর্জন করে।

রীতি বদ্ধ প্রায়োগিক কাল (Formal Operational Period):

রীতিবদ্ধ প্রায়োগিক কাল হচ্ছে, পিয়াঁজের চিন্তার বিকাশের সর্বশেষ স্তর। এই স্তরে শিশু যুক্তিপূর্ণ চিন্তা করতে শিখে এবং কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। এ বয়সের ছেলেমেয়েরা সত্য ভেবে সিদ্ধান্ত পৌছাঁয় এবং তাদের সময় জ্ঞান, বিভিন্ন অনুপাতের জ্ঞান ইত্যাদি ধারণার উন্নতি হয়। এ সময় শিশুরা যুক্তির আলোকে বিমূর্ত বিষয় নিয়ে চিন্তা ছাড়াও ব্যাখ্যা প্রদান, কারণ দর্শাও, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রকল্প প্রণয়ন করতে পারে।

শিক্ষাক্ষেত্রে পিয়াঁজের মতবাদ

শিক্ষাক্ষেত্রে জ্ঞান বিকাশের মতবাদটি নিয়ে বেশ গবেষণা হয়েছে। শিক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর জ্ঞান অর্জন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের মানসিক পরিণতির প্রয়োজন এবং সব শিশুই একই সময়ে সবকিছুতে পারদর্শী হতে পারে না। পিয়াঁজে মনে করেন যে, প্রত্যেক শিশুর মানসিক বিকাশ একইভাবে হয় না। পিয়াঁজের এই জ্ঞান বিকাশের মতবাদটি শিক্ষা জগতকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে।"

সারমর্ম:

সুইস বিজ্ঞানী জ্যাঁ পিয়াঁজে জ্ঞানীয় বিকাশ সম্পর্কে মতবাদ প্রদান করেন। তাঁর মতে, শিশুর জ্ঞানের বিকাশ মূলত পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর এক যোগ্যতা তিনি মানুষের জীবনকে জ্ঞান বিকাশের দৃষ্টিকোন থেকে মোট চারটি সময়কালে ভাগ করেছেন। সবাইকে এই স্তরগুলি একে একে অতিক্রম করতে হয়। প্রতিটি স্তরে শিশু নতুন কিছু দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন করে। তবে তিনি মনে করেন প্রত্যেক শিশুর মানসিক বিকাশ একইভাবে হয় না। তাঁর এই জ্ঞান বিকাশের মতবাদটি শিক্ষা জগতকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে।

পাঠ ২.৭ ভাষার বিকাশ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শিশুর ভাষা বিকাশের বিভিন্ন পর্যায় সর্ম্পকে বলতে পারবেন;
- শিশুর ভাষা বিকাশের ক্রমধারা বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- বিভিন্ন বয়সের শিশুর শব্দ ভান্ডারের বর্ণনা দিতে পারবেন।

ভাষার বিকাশ

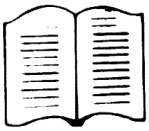

ভাষা হচ্ছে প্রতীকরূপে ব্যবহৃত যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম। ভাষা একদিকে শিক্ষা এবং অপরদিকে স্মৃতিশক্তির সাথে জড়িত। ভাষা, শিক্ষণ এবং স্মৃতি- এই তিনটির সমন্বয়ে মানুষ তার পরিবেশকে বুঝতে শেখে এবং চারপাশ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। ভাষা হচ্ছে অর্থপূর্ণ ধ্বনি যা কিনা অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, মূর্ত-বিমূর্ত সবই উলে-খ করে। অনেক সময় ভাষাকে আমরা মনের ভাবের প্রতীকও বলতে পারি।

শিশুর জীবনে প্রথম ধ্বনি হচ্ছে কান্না। শিশু ক্ষুধায় অস্বস্তিবোধে কেঁদে ওঠে। ক্রমে শিশুর কান্না উদ্দেশ্যমূলক হয়। পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে শিশু মা বা অন্য কোন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির কোলে উঠলে আনন্দিত ও তৃপ্ত হয়ে এক ধরণের শব্দ করে, এমনকি দুধ খাওয়ার পর অনেক শিশুকে এ ধরণের শব্দ করতে শোনা যায়। শিশুর এই কলকূজন বা Cooing কে ভাষার উৎস বলে ধরা হয়। অনেক মনোবিজ্ঞানী এটাকে Babbling ও বলে থাকেন। কলকূজনের মধ্যে দিয়ে শিশুর কথা বলার জন্য প্রয়োজনীয় পেশী ও স্নায়ুতন্ত্রের গঠন সুদৃঢ় হয়।

চিত্র ২.৭.১: শিশুর জীবনের প্রথম ধ্বনি হচ্ছে কান্না।

শিশু সুস্পষ্টভাবে শব্দ ব্যবহার করার পূর্বেই তার চারপাশের পরিচিতদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে চায়। যেমন- শিশু মাকে দেখে হাত পা নেড়ে উঁ! আ! শব্দ করে। ক্রমে শিশু তার অনুভূতি, রাগ, আগ্রহ, আনন্দ ইত্যাদি প্রকাশক ধ্বন্ত্মক শব্দে রূপন্তরিত করে। পরিস্কার কথা বলার আগে শিশু এভাবে তার মনের ভাব প্রকাশ করে।

শব্দ ব্যবহার করবার অনেক পূর্বেই শিশুরা সেগুলোর অর্থ বুঝতে পারে। আবার শব্দ বোঝার পূর্বেই তারা ধ্বনি এবং স্বরের উঠানামা বুঝতে পারে। যেমন:

- শিশুকে ব্যক্তির কণ্ঠধ্বনি, বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি বা সংগীতের চেয়ে অনেক বেশি সান্তনা দেয়।
- তিন মাস বয়সে রাগান্বিত স্বরের কণ্ঠধ্বনি এবং বন্ধুত্ব সুলভ কণ্ঠধ্বণির পার্থক্য করতে পারে।
- ৮/১০ মাস বয়সের মধ্যে শিশুরা নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে পারে।
- শিশুরা কথা শেখার পরও তাদের বোঝার ক্ষমতা বলার ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি।

স্বরধ্বনি করণ

শিশুর সঞ্চালনমূলক বিকাশের সঙ্গে তার স্বরধ্বনি বিকাশের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এই সম্পর্কও একটা নিয়মের মধ্যে চলে। যেমন-

১. নবজাতক জন্মবার সাথে সাথে স্বরধ্বনি উচ্চারণ করে এবং ধীরে ধীরে ভাব বিনিময়ের জন্য ধারাবাহিকভাবে কতগুলো ধাপের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়।
২. শিশুর প্রথম কান্না তার অস্বস্তি নির্দেশ করে। কিন্তু দুই মাস বয়সে কান্নার মাধ্যমে শিশু তার বিভিন্ন চাহিদা প্রকাশ করে।
৩. Cooing বা কলকূজন এক ধরণের ধ্বনি যার দ্বারা শিশু যে আরামে আছে তা বোঝায়। Cooing আরম্ভ হয় দুই মাস বয়সে।
৪. Babbling আরম্ভ হয় ৩/৪ মাস বয়সে। ব্যাবলিং এর মাধ্যমে শিশু স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ এবং অন্যান্য ধ্বনি উচ্চারণ করে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে। অনেক সময় ব্যাবলিং এর ধ্বনি পুনরাবৃত্তি করে শিশু আনন্দ পায়। শিশু একা থাকলে বেশি ব্যাবলিং করে।
৫. অনুকরণ করা ভাষা শেখার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংগ। নয় মাস বয়সে শিশুদের মধ্যে বড়দের অনুকরণ করার স্পৃহা বেশি দেখা যায়।

ভাব বিনিময়ের জন্য কথা বলা

শিশুর ভাব বিনিময়ের প্রথম প্রচেষ্টা হচ্ছে "একটি শব্দের দ্বারা বাক্য" রচনা যাকে বলা হয় Holophrase, এর মাধ্যমে সে তার সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করে। উক্ত ভাষার বিকাশ ঘটে প্রথম বছরের শেষের দিকে। উদাহরণস্বরূপ: শিশু যখন বলে "গাড়ি" তার অর্থ "আমি গাড়িতে যাব" অথবা 'এইটা' অর্থাৎ আমাকে ঐ জিনিসটা দাও।

শিশু দ্বিতীয় বছরে তার বাক্য বর্ধিত করে ২/৩ শব্দের বাক্য রচনা করে যাকে বলা হয় Telegraphic Speech. যেমন: 'ঘোড়া দেখ' বা 'বাবা অফিস' ইত্যাদি।

Telegraphic Speech এর পর শিশু ভাষার ব্যাকরণ শেখে এবং সম্পূর্ণ বাক্য রচনা করতে পারে।

ভাষা উন্নয়ণের মাইলফলক

নিচের তালিকায় বিভিন্ন বয়সে শিশুর ভাষার বিকাশের ধারা দেখানো হল:

বয়স	ভাষার বিকাশ
৩ মাস	শিশুর আট সপ্তাহের দিকের কান্নার সময় উলে- খযোগ্য ভাবে হ্রাস পায়। এ সময়ে তার সঙ্গে কথা বললে হাসে, কুজন (Cooing) করে। এই কুজন আ-আ-উ-উ ধ্বনির মত। ১৫/২০ সেকেন্ড স্থায়ী হয়।
৪ মাস	মানুষের আওয়াজ/ শব্দে সাড়া দেয় নির্দিষ্টভাবে মাথা নাড়ে, বক্তাকে খোঁজ করে, মাঝে মাঝে মুখ টিপে হাসি দেয়।
৬ মাস	Cooing বা কুজনের স্বরধ্বনি ছাড়িয়ে কিছুটা অন্য ধরণের শব্দ উচ্চারণ করে। পরিবেশের ভাষার সঙ্গে তার কোন মিল থাকে না। ধীরে ধীরে কুজন কমতে থাকে। এক ধ্বনির শব্দাংশর উচ্চারণ দেখা যায়। যেমন- মা, মু, দি, দা ইত্যাদি।
৮ মাস	পুনরাবৃত্তি ঘনঘন হওয়া শুরু করে। স্বরভেদে স্পষ্ট হতে শুরু করে, উচ্চারণের মাধ্যমে জোর, আবেগ প্রকাশ করতে পারে।
১০ মাস	গলায় বিভিন্ন আওয়াজ নিয়ে শব্দ খেলা করে। আওয়াজ অনুকরণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। প্রথম থেকেই শোনা শব্দের মধ্যে পার্থক্য খুঁজতে আরম্ভ করে।
১২ মাস	মামা, দাদা, বাবা ইত্যাদি বলতে পারে। অনেক কথা বুঝতে পারে।
১৮ মাস	অনেক শব্দ (তিনের বেশি ও পঞ্চাশের কম) বলতে পারে। দু'একটি শব্দের আধো আধো বাক্য বলতে পারে। এ সময় বুঝার শক্তি দ্রুত বাড়তে থাকে।
২৪ মাস	শব্দ ভান্ডার ৫০ এর বেশি শব্দ হয়। অনেক শিশু এ সময় আশেপাশের সব জিনিসের নাম বলতে পারে। স্বত:স্ফূর্তভাবে শব্দভান্ডারের ২ শব্দ যুক্ত শব্দ তৈরি করতে শুরু করে। ভাষা ব্যবহার ও স্পৃহার মাধ্যমে নিজস্ব কিছু তৈরি করতে উৎসাহ পায়।
৩০ মাস	প্রতিদিন শব্দ ভান্ডারে নতুন নতুন অতিরিক্ত শব্দ যুক্ত হয়। উচ্চারণ বা কথায় যোগাযোগের ইচ্ছা প্রকাশ পায়। কমপক্ষে ২- শব্দ যুক্ত বাক্য উচ্চারণ করে এবং অনেক সময় ৩/৫ শব্দ যুক্ত বাক্য উচ্চারণ করে। ব্যাকরণ দিয়ে কথা বলে। বড়দের উচ্চারিত কোন শব্দ অক্ষরে অক্ষরে পুনরাবৃত্তি করে।
৩ বছর	শব্দ ভান্ডার হাজার শব্দে পৌছায়। তাদের কথার শতকরা ৮০ ভাগই অপরিচিতরা বুঝতে পারে।
৪ বছর	ভাষার বিকাশ সম্পূর্ণতার দিকে যেতে থাকে।

এভাবে ধীরে ধীরে ৬ বছর বয়সে একজন শিশু সহস্র শব্দের জ্ঞান সম্পন্ন একজন ভাল যোগাযোগকারীতে পরিণত হয়। তখন সে বিভিন্ন যুক্তির মাধ্যমে ভাষা ব্যবহার করে এবং ভাষার পান্ডিত্য অর্জন করে। পরিশেষে মনে রাখতে হবে, শিশুর ভাষা বিকাশের এই ধারা বা ক্রম সব শিশুর ক্ষেত্রে মোটামুটি এক হলেও ব্যক্তিভেদে তারতম্য দেখা যেতে পারে।

সারমর্ম:

যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে ভাষা, মানব জীবনে ভাষার বিকাশ একটি জটিল প্রক্রিয়া। শিশু কথা বলার আগে তার অর্থ বুঝতে পারে। ভাষার বিকাশে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট স্তর দেখা যায়। এগুলো হল- ধ্বনি, কলকূজন, ব্যাবলিং, সহজ শব্দ উচ্চারণ, এক শব্দে বাক্য, দুই/তিন শব্দে বাক্য ইত্যাদি। শিশুর জীবনে প্রথম ধ্বনি হচ্ছে কান্না। তিন/চার মাসে শিশু কিছু অর্থহীন শব্দ উচ্চারণ কলে কলকূজন, ব্যাবলিং করে থাকে। নয় মাস বয়সে শিশুদের মধ্যে অনুকরণ করার স্পৃহা দেখা যায়। ১২ মাস বয়সে মামা, দাদা, বাবা বলতে পারে। ১৮ মাসে ২/১টি শব্দের আধা আধা বাক্য বলতে পারে। ২৪ মাসে শব্দের ভান্ডার ৫০ এর বেশি হয়। ৩০ মাসে ব্যাকরণ দিয়ে কথা বলে। ৪ বছরে ভাষার বিকাশ সম্পূর্ণতার দিকে যায়। ৬ বছরে যুক্তির মাধ্যমে ভাষা ব্যবহার করে এবং ভাষার পান্ডিত্য অর্জন করে।

পাঠ ২.৮ সামাজিক বিকাশ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ❑ শিশুর সামাজিক বিকাশ কখন থেকে শুরু হয় তা বলতে পারবেন;
- ❑ পরিবারের ধরণ শিশুদের মধ্যে কী কী পরিবর্তন আনতে পারে তা উল্লেখ করতে পারবেন;
- ❑ সামাজিক বিকাশে বিদ্যালয়ের প্রভাব এবং সমবয়সী দলের প্রভাব আলোচনা করতে পারবেন।

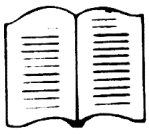

শিশু জন্মগ্রহণ করে একটি সামাজিক পরিমন্ডলে। যখন সে প্রথম এই পৃথিবীতে আসে তখন তার মধ্যে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদি কতকগুলো জৈবিক চাহিদা এবং প্রতিবর্ত ছাড়া আর কোন সামাজিক বা পরিণত আচরণ লক্ষ্য করা যায় না। শিশু যে সমাজে বা পরিবেশে বাস করে ধীরে ধীরে তার মধ্যে সমাজোপযোগী আচরণেরই বিকাশ ঘটে। সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি, আচরণ, মূল্যবোধ সবকিছু একটি শিশুকে এমনভাবে প্রভাবিত করে যাতে করে সে সেই সমাজেরই একজন হিসাবে গড়ে ওঠে।

সামাজিকীকরণ বা সামাজিক বিকাশ কেবলমাত্র শিশুকাল পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থাকে না, এটি একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। এক কথায় বলা যায় জন্মলগ্ন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি তার সামাজিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে নিজের উপযোজন সাধন করে বা খাপ খাওয়ায় তাকেই সামাজিকীকরণ বলে।

শিশুর সামাজিক বিকাশ

জীবনের প্রথম থেকেই সামাজিক বিকাশ শুরু

শৈশবে শিশু প্রথমে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলে তার পিতামাতার সাথে এবং পরবর্তীতে সমবয়সীদের সাথে। কি করে খেলার মাঠে, শ্রেণীকক্ষে, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক পরিবেশে সম্পর্ক তৈরি করতে হয় শিশু ক্রমান্বয়ে তা শিখে নেয়।

শিশুর সামাজিক বিকাশ মূলত জীবনের প্রথম থেকেই শুরু হয়। জন্মের পর জৈবিক চাহিদা পূরণের ভেতর দিয়েই মা শিশুকে সামাজিকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল করে তোলে। খুব ছোটবেলা থেকেই মা ও বাবা উভয়ই শিশুর উপর সমভাবে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। জীবনের প্রথম কয়েক মাস থেকেই শিশুর হাসা, স্বরধ্বনি, কূজন ইত্যাদির মাধ্যমে সে তার মা-বাবার সাথে সম্পর্ক তৈরি করে। মা-বাবাও তার প্রতিক্রিয়ায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। মা-বাবা নবজাতক শিশুর সাথে কথা বলে, তাকে স্পর্শ করে, আদর করে কোলে তোলে, তার জৈবিক চাহিদাগুলো পরিতৃপ্ত করে। জীবনের এই প্রথম ক'মাসই শিশুর সাথে তার মা-বাবার একটা গভীর আবেগীয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে,- যা টিকে থাকে বহু বছর। ধীরে ধীরে শিশু যত বড় হতে থাকে ততই তার উপর পরিবারের অন্য সদস্যের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। তবে শিশুরা অধিক সময় যাদের সাথে থাকে তাদের প্রভাবই বেশি হয়। শিশুর উপর তার মা-বাবার প্রভাব কতটুকু পড়বে তা নির্ভর করে মা-বাবার আচরণের ধারা এবং তাদের লালন-পালন প্রক্রিয়ার উপর।

বাবা-মায়ের "সান্নিধ্য" শিশুর সামাজিক বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। বাবা-মা সহজেই নবজাতকের প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলো মিটিয়ে গভীর সংস্পর্শে আসতে পারেন। একটি শিশু সবসময় চায় বাবা-মা এর মনোযোগ, আদর, ভালবাসা ও সেই সাথে তার জৈবিক তৃপ্তি। এই পরিতৃপ্তির মাধ্যমেই শিশুর সাথে মায়ের একটা গভীর সান্নিধ্য গড়ে ওঠে। নিচে কয়েকটি নির্বাচিত ক্ষেত্রে শিশুর সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া তালিকাভুক্ত করা হল।

শৈশবকাল: সামাজিকীকরণ

১। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশু তার দেশের, সমাজের এবং পরিবারের গ্রহণযোগ্য আচরণ আয়ত্ব করে।

২। বাবা-মা তাকে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ শেখান এবং কিভাবে নানা ধরণের আবেগীয় বহিঃপ্রকাশ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয় সেটিও শেখান। পুরস্কার, প্রশংসা এবং শাস্তির মাধ্যমে শিশুকে শেখানো হয় শৃংখলা।

৩। সামাজিকীকরণের মাধ্যমে শিশু যে সকল আচরণ আয়ত্ব করে সেগুলো হল মলমূত্র ত্যাগের প্রশিক্ষণ, সঠিকভাবে খাওয়া, বন্ধুত্ব স্থাপন করা, অন্যের সম্পত্তি রক্ষা করা এবং অন্যের অধিকারের প্রতি সম্মান দেখানো।

৪। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় বাবা-মার ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ শিশুরা চায় বাবা-মার ভালবাসা। আর সে জন্যই তারা বাবা-মাকে খুশি করতে সর্বদা সচেষ্ট হয়।

মলমূত্র নিয়ন্ত্রণ

১। বেশির ভাগ শিশুরই ২ বছর বয়সে মলমূত্র ত্যাগের প্রশিক্ষণ হয়ে যায়। এবং এই বয়সেই তার মলমূত্র ত্যাগ নিয়ন্ত্রণ ও মাংশপেশীর পরিপক্কতা লাভ করে।

২। ফ্রয়েড এর মতে, মলমূত্র ত্যাগের প্রশিক্ষণ সুষ্ঠভাবে না হলে শিশুর ব্যক্তিত্বে সমস্যা এবং দ্বন্ধ দেখা দিতে পারে।

৩। অনেক মায়েরা শাস্তি দেন বলে শিশুরা যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করাকে ভয় পায়।

৪। মায়েরা যদি প্রথম বছর হতে সহানুভূতিশীল হন তাহলে শিশুরা উক্ত প্রশিক্ষণ সহজেই আয়ত্বে করতে পারে এবং দুশ্চিন্তা এবং দ্বন্দ্ব মুক্ত হয়।

ছেলে-মেয়েদের ভূমিকা (Sex Roles)

১। পূর্বে মনে করা হতো, ছেলে এবং মেয়ের জন্মগত বৈশিষ্ট্য ভিন্ন।

২। বর্তমানে গবেষণায় দেখা গেছে, ছেলেদের মধ্যে আক্রমনাত্মক আচরণ ছাড়া অন্যান্য আচরণে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই।

৩। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মা-বাবারা ছেলেদের এবং মেয়েদের ভিন্ন আচরণ শিক্ষা দিয়ে থাকে।

৪। দেখা গেছে, মায়েরা তাদের কন্যা সন্তানের সাথে বেশি কথা বলেন পুত্র সন্তানের তুলনায়।

৫। মেয়েদের শেখানো হয় স্নেহপরায়ণ, শান্ত এবং মিশুক হওয়ার জন্য এবং ছেলেদের শেখানো হয় সাবলম্বী এবং সক্রিয় হওয়ার জন্য।

৬। তবে আধুনিক যুগ সমান অধিকারের যুগ এবং সেক্ষেত্রে মা-বাবা চেষ্টা করবেন উভয়কেই একই ধরণের শিক্ষা দিতে।

শিশুর লালন-পালন পদ্ধতি

১। মায়েরা নিজেরা যেভাবে বড় হয়েছেন তাঁরা চেষ্টা করেন তাঁদের সন্তানদের সেভাবে লালন-পালন করতে।

২। তবে আধুনিক যুগে বিশেষ বিশেষ ধরণের শিশু লালন-পালন পদ্ধতির মানসিক প্রভাবের উপর জোর দেয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে ফ্রয়েডের মতবাদে প্রভাবিত হয়ে অনেকেই মনে করেন কড়া শাসন শিশুর জন্য ক্ষতিকর।

৩। আবার অনেক বাবা-মায়েরা এও মনে করেন যে, অতিরিক্ত যত্নে শিশু নষ্ট হয়ে যায়।

৪। প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী এরিকসন এর মতে, শিশুর চাহিদা পূরণের মাধ্যমেই গড়ে ওঠে শিশুর মধ্যে মৌলিক বিশ্বাস।

৫। শৃংখলা শেখাবার জন্য এবং শিশুকে বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য "না" সংকেতের প্রয়োজন রয়েছে।

৬। যখন বাবা-মা এবং শিশুর মধ্যে বিশ্বাস এবং আসক্তির শক্ত বন্ধন গড়ে ওঠে শিশু সহজেই নিয়মানুবর্তিতা মেনে নেয় বাবা-মাকে খুশী করার জন্য।

সামাজিকীকরণ মূলত একটি সামাজিক শিক্ষণ প্রক্রিয়া। শিক্ষণের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াগুলোর মাধ্যমেই শিশুর সামাজিক শিক্ষণ বা সামাজিকীকরণ ঘটে। প্রত্যক্ষভাবে অনেকগুলো উপাদান সামাজিকরণের সাথে জড়িত। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

১। পরিবার ২। বিদ্যালয় ৩। সম-বয়সী দল

পরিবারের প্রভাব

পূর্বেই জেনেছি, শিশুর সামাজিক বিকাশের প্রথম ও সর্ব প্রধান মাধ্যম তার পরিবার, ভূমিষ্ঠ হওযার পর থেকেই সে পরিবারের সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত হয়। জীবন ধারণের জন্য একটি শিশু যে ব্যক্তির উপর প্রাথমিক ভাবে নির্ভরশীল থাকে তিনি তার মা। কিছু কিছু জীব-মনোবিজ্ঞানীদের মতে, মায়ের পেটে থাকা অবস্থাতেই শিশুর সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। মায়ের আচরণ শিশুর আচরণকে প্রভাবিত করে। ধীরে ধীরে বিভিন্ন চাহিদা নিবৃত্তির উৎস হিসাবে শিশু তার পিতাকে পায়। ফলে পিতাও শিশুর সামাজিকরণে অন্যতম প্রধান মাধ্যম হিসেবে পরিণত হয়। সুতরাং পরিবার থেকেই প্রাথমিকভাবে, শিশু অর্জন করে তার সামাজিক মনোভাব, মূল্যবোধ ও ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য যা পরবর্তী জীবনে বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্ক ও অবস্থার সাথে উপযোজনের নির্দ্ধারক হিসাবে কাজ করে।

বিদ্যালয়ের প্রভাব

বিদ্যালয় হচ্ছে শিশুর জীবনে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার প্রথম আনুষ্ঠানিক বাহন। পরিবারের ভূমিকা যেখানে অনানুষ্ঠানিক, বিদ্যালয় হচ্ছে সেখানে আনুষ্ঠানিক। বিদ্যালয়ের সব কাজ কর্মই একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থার মধ্যে সম্পন্ন হয়। সময়মত আসতে হয়, যেতে হয়, সব কিছুই নিয়মতান্ত্রিক। এ কারণে বলা হয় "School is the Formal Preparation for the Adulthood" একজন শিশুকে প্রাপ্ত বয়স্কদের দায়-দায়িত্ব শিক্ষা দেবার একটি আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি কেন্দ্র হচ্ছে বিদ্যালয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের অনুষ্ঠান, যেমন- খেলাধূলা, গান ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুর সৃজনশীলতা বিকাশের সুযোগ হয়। বিদ্যালয়ে প্রবেশের মাধ্যমেই শিশু আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে, যা তার সামাজিক বিকাশের সহায়ক। প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োজনীয় ধারণার বিকাশ সাধন- বিদ্যালয়ের মাধ্যমেই অর্জিত হয়।

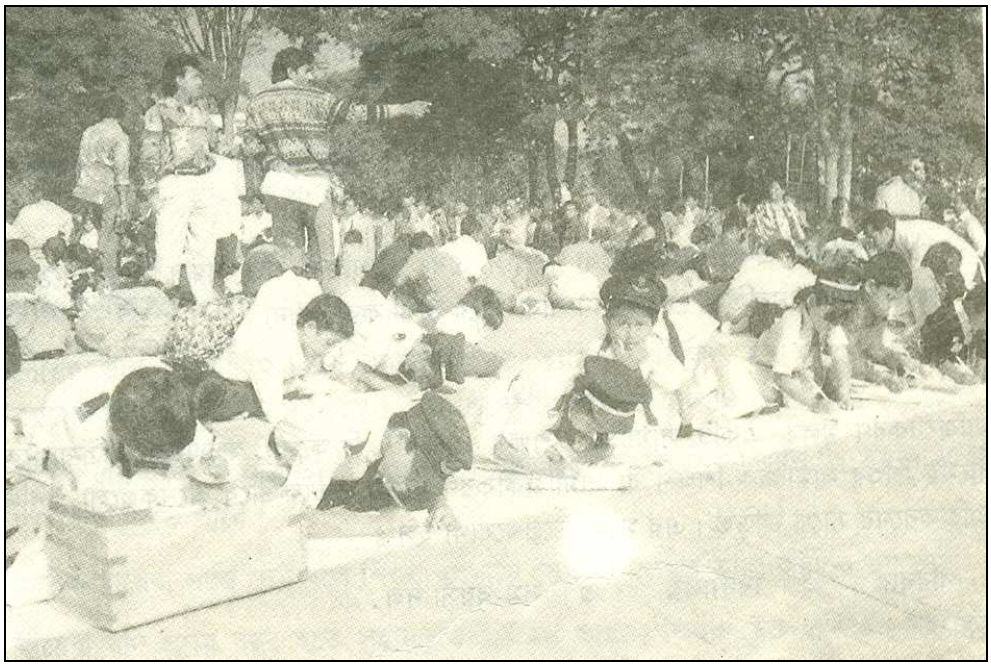

চিত্র ২.৮.১: বিদ্যালয় শিশুর সামাজিক বিকাশে সহায়তা করে।

সম-বয়সী দলের প্রভাব

শিশুর সামাজিক বিকাশে সম-বয়সী দল এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সম-বয়সী দলের মাধ্যমে শিশু তার সমবয়সীদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করবে তা শেখে। অপরের সাথে জিনিস ভাগাভাগি করা শেখে, অন্যদের মাঝে কিভাবে নেতৃত্ব দেবে- তা সে দল থেকেই শিখে থাকে। দলের ভিতর সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা শিশুকে আস্থাশীল করে তোলে। দলের মধ্য দিয়েই শিশু বাস্তববাদী হতে শিখে। যদিও দলে মিশে অনেক শিশু কিছু বদ-অভ্যাস যেমন- সিগারেট খাওয়া, তাস খেলা বা কোন অসংগত আচরণ শেখে তবুও এসব ক্ষণস্থায়ী। মূলত এগুলোর পরিচয় ঘটে সম-বয়সী দলের মাধ্যমেই। যে সব শিশু দল হতে বিচ্ছিন্ন থাকে বা দলের সাথে মিশতে পারে না, তারা সাধারণত মনের দিক থেকে ছোট হয়ে পড়ে এবং একাকীত্বের যন্ত্রনায় ভুগে থাকে। শিশুরা

সাধারণত ৫/৬ বছর বয়স থেকেই ছোট ছোট দল বেধে মিশতে থাকে। খেলতে খেলতে শিশুর সামাজিক বিকাশ আরো এক ধাপ এগিয়ে যায়। দেখা যায়, ৯/১০ বছরে শিশু দলে থাকতে ভালবাসে এবং দলের কাছ থেকে স্বীকৃত আশা করে। ১০/১১ বছরের শিশুর মধ্যে দলের আকর্ষণ বেশি হয়। এই সময়ে শিশুদের বন্ধুদের সংখ্যাও বাড়ে। এই সময় থেকেই শিশুর সামাজিক বিকাশ অনেকটা তার দলের মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে। সামাজিক আচরণের বিকাশ এই সময়ে যত স্ফূর্তভাবে হয় অন্য কোন সময় ততটা হয় না।

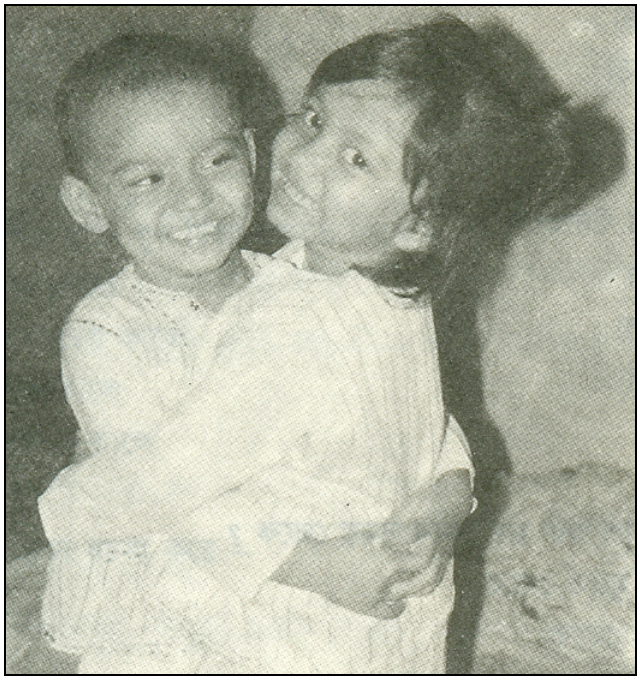

চিত্র ২.৮.২: বন্ধুর প্রভাব।

উপরের আলোচনা থেকে এটাই বোঝা যায় যে, বন্ধুত্ব শিশুর সামাজিক জীবন বিকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। শিক্ষক ও অভিভাবকগণ যদি একটু সচেতন হন তবে খুব সহজেই শিশুদের সামাজিক বিকাশকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আসতে পারেন।

সারমর্মঃ

শিশুর সামাজিক বিকাশ মূলত জীবনের প্রথম থেকেই শুরু হয়। শিশুর উপর পরিবারের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। বাবা-মায়ের "সান্নিধ্য" শিশুর সামাজিক বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। শিশুর সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন বাবা-মা। পরিবার ছাড়া বিদ্যালয়, সম-বয়সী দলের প্রবাব শিশুর সামাজিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। বিদ্যালয় হচ্ছে-শিশুর সামাজিকীকরণের প্রথম আনুষ্ঠানিক বাহন। জীবনে প্রয়োজনীয় ধারণার বিকাশ সাধন বিদ্যালয়ের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। বন্ধুত্ব শিশুর সামাজিক জীবন বিকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। মা-বাবা যদি প্রথম থেকেই ছেলেমেয়েদের মানুষ করার ব্যাপারে সুষ্ঠু ও বাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন তবে শিশুরা যথাযথভাবেই নিজেদের জীবনকে গড়ে তুলতে পারবে।

চূড়ান্ত মূল্যায়নঃ ইউনিট ২

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. কোনটি বিকাশ?
ক. লিখতে পারা
খ. উচ্চতায় বাড়া
গ. আয়তনে বাড়া
ঘ. ওজনে বাড়া।

২. কোনটি পরিমণের উদাহরণ?
ক. সাতাঁর কাটা
খ. ক্রিকেট খেলা
গ. লিখতে পারা
ঘ. বসতে শেখা।

৩. শিশুর জীবন বিকাশ শুরু হয় কোন সময় থেকে?
ক. গর্ভধারণের মুহূর্ত থেকে
খ. জন্মের সময় থেকে
গ. জন্ম-পরবর্তী সময় থেকে
ঘ. ভ্রূণ অবস্থা থেকে।

৪. এক বছর বয়সে শিশুর ওজন জন্মের ওজনের কতগুণ হয়–
ক. দ্বিগুণ
খ. তিনগুণ
গ. চারগুণ
ঘ. পাঁচগুণ।

৫. শিশুর জন্মের সময় মস্তিষ্কের ওজন–
ক. প্রাপ্ত বয়স্ক মস্তিস্কের ওজনের ভাগ ১/৮ থাকে
খ. প্রাপ্ত বয়স্ক মস্তিস্কের ওজনের ভাগ ১/4 থাকে
গ. প্রাপ্ত বয়স্ক মস্তিস্কের ওজনের ভাগ ১/২ থাকে
ঘ. প্রাপ্ত বয়স্ক মস্তিস্কের ওজনের ভাগ ৩/4 থাকে।

৬. কোনটি সঞ্চালনমূলক কাজ নয়?
ক. হাটাঁ
খ. বসা
গ. ঘুমানো
ঘ. দাড়াঁন।

৭. শিশুর সামাজিক হাসি কখন আরম্ভ হয়?
ক. ২/৩ মাস
খ. ৩/৪ মাস
গ. ৪/৫ মাস
ঘ. ৫/৬ মাস।

৮. শিশু স্নায়ুবিক প্রতিবর্ত ক্রিয়া প্রদর্শন করে কোন সময় থেকে?
ক. ০ - ১ মাস
খ. ১ - ২ মাস
গ. ১- ৩ মাস
ঘ. ১ - ৪ মাস।

৯. নিচের কোন স্তরে শিশু যুক্তি পূর্ণ চিন্তা করতে শিখে?
ক. প্রাক-প্রায়োগিক কালে
খ. ইন্দ্রিয় পেশীর সমন্বয় কালে
গ. বাস্তব প্রায়োগিক কালে
ঘ. রীতিবদ্ধ প্রায়োগিক কালে।

১০. শিশুর ২/৩ শব্দের বাক্য রচনা করে–
ক. ৯ মাস বয়সে
খ. প্রথম বছরে
গ. দ্বিতীয় বছরে
ঘ. তৃতীয় বছরে।

নিজে নিজে করুন

১. আপনি এক, তিন, পাঁচ, সাত ও নয় মাসের পাঁচটি শিশুকে দুই ঘন্টা করে পর্যবেক্ষণ করে তার উপর বিস্তারিত একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করুন।

২. একই বয়সের দুটো শিশুর বিকাশ প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষন করে তাদের ব্যক্তি পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করুন।

৩. তিন মাস বয়স থেকে ১৫ মাস বয়স পর্যন্ত একটি শিশুর সঞ্চালনমুলক বিকাশের উপর একটি স্ক্রেপ বুক প্রস্তুত করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১

১. বর্ধন, বিকাশ ও পরিণমন উদাহরণসহ বুঝিয়ে দিন।

২. সুস্থ, স্বাভাবিক বিকাশমান শিশু কী কী নৈপূণ্যের অধিকারী হয়?

৩. Cephalocaudal ও Proximodistal Principle এর মাঝে কী পার্থক্য?

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.২

১. শিশুর জন্মপূর্বকালকে কতটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছ এবং কী কী?

২. জন্মপূর্বকালের বিকাশধারা আলোচনা করুন।

৩. গর্ভ-ধারণের পর শিশুর জন্ম হতে মোট কত দিন সময় লাগে?

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৩

১. জন্মের পর থেকে শিশুর ওজন ও উচ্চতা বৃদ্ধির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

২. কত বয়সে শিশুর প্রথম দাঁত উঠে? এবং কত বৎসর বয়সে তার সকল দাঁত ওঠা শেষ হয়।

৩. শিশুরা সুক্ষ্ম অঙ্গ সঞ্চালনের কাজগুলি কখন করতে সমর্থ হয়?

৪. শিশুর প্রত্যক্ষণমূলক ক্ষমতাগুলি কীভাবে প্রকাশ পায়?

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৪

১. পেশীজ সঞ্চালন কী এবং তা কত প্রকার উল্লেখ করুন।

২. বিভিন্ন অঙ্গ সঞ্চালন বিকাশের ধারা বর্ণনা করুন।

৩. কত বছর বয়সে শিশুর হাত দিয়ে ধরার ক্ষমতা পরিপূর্ণতা পায়?

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৫

১. বাল্যকালে উচ্চতা ও ওজনের বর্ণনা দিন।

২. তিন ধরণের দৈহিক কাঠামোর বর্ণনা দিন।

৩. বাল্যকালের দৈহিক বৃদ্ধির অনুপাত বর্ণনা করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৬

১. পিয়াঁজের জ্ঞান বিকাশ তত্ত্বের মূল ধারণা কী?

২. পিয়াঁজের জ্ঞান বিকাশ মতবাদের স্তরগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করুন?

৩. প্রাক-ধারণা স্তরের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন।

৪. শিক্ষাক্ষেত্রে পিয়াঁজের মতবাদ কতটুকু অবদান রাখতে পারে তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৭

১. সংক্ষেপে শিশুর ভাষা বিকাশের ধারা বর্ণনা করুন।

২. কুইং বা কলকূজন বলতে কী বুঝায়?

৩. শিশুর শব্দ ভান্ডারের ক্রমবধিষ্ণু প্রক্রিয়া আলোচনা করুন।

৪. শিশুর ভাষা বিকাশের একটি চার্ট প্রস্তুত করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৮

১. সামাজিকীকরণ বলতে কী বুঝায়?

২. শৈশবকালে শিশুর সামাজিক বিকাশ বর্ণনা করুন।

৩. শিশুদের সামাজিক বিকাশে বিদ্যালয় এবং সম-বয়সীদের প্রভাব কিভাবে পড়ে তা আলোচনা করুন।

উত্তরমালা: ইউনিট ২

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

১। ক; ২। ঘ; ৩। ক; ৪। খ; ৫। খ; ৬। গ; ৭। ক; ৮। ক; ৯। ঘ; ১০। গ;।